Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি ও কেন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া তাসনিম

রোলঃ 227022215

২৪ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আত্মার পবিত্রতা কি ও কেন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া তাসনিম

রোলঃ 227022215

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আত্মার পবিত্রতা কি ও কেন" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া তাসনিম, আইডিঃ 227022215 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আত্মার পবিত্রতা কি ও কেন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুমাইয়া তাসনিম

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া তাসনিম

আইডিঃ 227022215

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৪ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

আত্মার পবিত্রতা কী ও কেন

بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

ভূমিকা:

আত্মার পবিত্রতা দ্বীনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নাফস পবিত্র হওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনো বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। উল্লেখ্য যে, মানুষের দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো বাহ্যিক, অপরটি হলো অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক দিককে পূত-পবিত্র করতে চায়, তেমনি তার ভেতরের দিকটিকেও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত ও সুন্দর করতে চায়। মানুষের এ অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ আত্মিক দিকটির পরিশুদ্ধিকেই কোরআনের ভাষায় 'তাযকিয়াহ' বলা হয়। বস্তুত একজন মানুষ তার নাফসকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষতা দূরীকরণের মাধ্যমে নিজের আবেগ-অনুভূতিকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দীনের বাহ্যিক 'ইবাদাতসমূহ স্বয়ং তার আবেগ ও নাফসের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে। যদি কেউ বাহ্যিক ও প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ পালন করে; কিন্তু তার নাফস পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়, তা হলে তার সে 'আমাল ঐ ফুলের মতো, যার রং সুন্দর ও আকর্ষণীয়; কিন্তু তাতে কোনো সুঘ্রাণ নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরীক্ষা করতে হয়, তা হলে অবশ্যই দেখতে হবে যে, তার অন্তর কতোখানি পবিত্র ও কলুষতামুক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহর অন্তরকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন; বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়।
সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ، وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের বাহ্যিক রূপের দিকে তাকাবেন না; বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই তাকাবেন।" (মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল বির.., হা.নং: ৪৬৫০)

নুবুওয়াতের চারটি মহান কর্তব্যের মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধকরণ অন্যতম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, অথচ তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (আল কোরআন, সূরা আলে 'ইমরান, ৩: ১৬৪)

কাজেই নাফস পবিত্র করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ। ইসলামের সকল 'আলিমের মতে, নাফস পবিত্র করার চেষ্টা করা ফারযে 'আইন। কেননা, নাফস ত্রুটিযুক্ত ও কলুষিত হলে যেমন বান্দাহর কোনো 'আমালই নির্দোষ ও পবিত্র হতে পারে না, তেমনি নাফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে ঈমানের স্বাদ লাভ করা, দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় নাফসের মন্দ প্রবণতাসমূহ দূরীকরণ ও তাকে পবিত্র করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর কেউ যদি নাফস পবিত্র করতে সচেষ্ট না হয়, তার ব্যাপারেও চরম সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সাইয়িদুনা নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

নিশ্চয়ই শরীরে গোশতের একটি টুকরো আছে, যা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো! সেই টুকরোটি হলো কালব (অন্তর)। (বুখারী, আস-সাহীহ, কিতাবুল ঈমান, হা.নং: ৫২; মুসলিম, আস-সাহীহ, কিতাবুল মুসাকাত, হা.নং: ৪১৭৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো শরীরের 'আমালের ইসলাহ ও সংশোধনকে অন্তরের ইসলাহ ও সংশোধনের ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, অন্তরে ত্রুটি দেখা দিলে পুরো শরীরের 'আমালের মধ্যেও ত্রুটি ও বিপর্যয় দেখা দেয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১ হি.] (রাহ.) বলেন,

إن الله على العبد عبوديتين :عبودية باطنة ، وعبودية ظاهرة فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية ، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن

حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه ، ولا يوجد له الثواب وقبول عمله .

বান্দাহর ওপর আল্লাহ তা'আলার দু প্রকারের 'ইবাদাতের দায়িত্ব রয়েছে। এক. বাতিনী (অপ্রকাশ্য) 'ইবাদাত ও দুই. যাহিরী (প্রকাশ্য) 'ইবাদাত। বান্দাহকে যেমন তার কালবের মাধ্যমে আল্লাহর 'ইবাদাত করতে হয়, তেমনি তাকে তার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোগেও তাঁর 'ইবাদাত করতে হয়। বাতিনী 'ইবাদাতের সারবিহীন 'ইবাদাতের বাহ্যিক রূপের চর্চা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য সহায়ক নয়। তদুপরি এ জাতীয় 'ইবাদাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না এবং এ 'আমাল কবুল ও হবে না। (ইবনুল কাইয়্যিম, বাদা'য়িউল ফাওয়া'য়িদ, খ. ৩, পৃ. ৭১০)

সুতরাং এ প্রবন্ধটিতে আমরা জানতে পারবো আত্মার পবিত্রতা কি এবং কেন প্রয়োজন ইন শা আল্লাহ।

রূহ এবং প্রবৃত্তি:

রূহ বা আত্মা মানবদেহস্থিত একটি পৃথক অদৃশ্য বস্তু। মহান আল্লাহ পাক অদৃশ্যে বিশ্বাস করতে বলেছেন। রূহ দৃশ্যমান নয়, অথচ রূহ আছে একথা অবশ্যই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে। মানব জীবন বলতে যা বুঝায়, তা সার্বিকভাবে রূহ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।"

আর 'নাফস' শব্দ দ্বারা যদি আত্মা বুঝানো না হয়, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি রূহ থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র। প্রবৃত্তি রূহের কাজ করতে পারে না। রূহ মানুষকে কল্যাণকর কাজের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্য উপকারী পথ ও মতের অনুসারী হওয়ার জন্য আহ্বান জানায়। পরকালীন জিন্দেগীর মুক্তি ও নিষ্কৃতির দিক নির্দেশনা প্রকাশ করে রূহ। মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক মনোনীত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগকৃত কর্মানুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকা বা হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে তোলে রূহ। রূহানী শক্তি থেকেই পবিত্র চরিত্র মাধুর্য, বিবেকবুদ্ধি, ধৈর্য, সহনশীলতা, দানশীলতা ও মানবতাসুলভ চারিত্রিক গুণাবলি অর্জিত হয়। রূহ পবিত্রতার প্রতীক। এজন্য পবিত্র জীবনের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভা দেহ ও কর্মে বিকশিত করে তোলার পেছনে রূহের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। পক্ষান্তরে নাফস বা প্রবৃত্তি মানুষকে দুনিয়ার জীবনের সুখ সম্পদের দিকে, যশ-মান-গৌরব ও পানাহারের দিকে, ভোগ-বিলাসে মত্ত হওয়ার দিকে, আরাম-আয়েশে বিভোর হওয়ার দিকে এবং পাপাচার ও কামাচারের দিকে আহ্বান জানায়। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরোধিতা করার জন্য ক্ষেপিয়ে তোলে। এমনকি মনুষ্যত্বকে পশুত্বের স্তরে অবনমিত করার পথ খোলাসা করে তোলে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তি শয়তানের দোসর। শয়তান আগুনের তৈরি। তার কাজই হলো আল্লাহর বিরোধিতা করা, বনী আদমকে বিপথগামী করা।কাম-ক্রোধ লোভ-মোহে আচ্ছন্ন করে মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করা। এই নাফস বা প্রবৃত্তির তিনটি রূপ আল-কুরআনে তুলে ধরা হয়েছে।

(ক) নাফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তি, (খ) নাফসে লাউয়্যামাহ বা অনুশোচনাকারী প্রবৃত্তি এবং (গ) নাফসে মুতায়িন্নাহ অর্থাৎ প্রশান্তকারী প্রবৃত্তি। নাফসে আম্মারাহ বা কুপ্রবৃত্তির

কাজ হলো মন্দকাজে ধাবিত করা। পাপ, অমঙ্গল, অকল্যাণ, অপবিত্রতা ও আল্লাহদ্রোহিতার পথে ধাবিত করে মানুষকে বিপথগামী করাই 'নাফসে আম্মারাহ'-এর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

পাপাসক্ত মানুষ কখনো কখনো পাপের প্রতি ঘৃণাবোধ করে এবং পাপ ও অন্যায়ের জন্য অনুশোচনা করে, আফসোস করে। মনে মনে ভাবে আহা। পাপ কাজে লিপ্ত না হলে কতই না ভালো হতো, কী অন্যায়ই না আমি করে ফেলেছি, এমনটি করা আমার মোটেও উচিত হয়নি। এমনি তার অনুতাপ ও শাসন-চেতনা মনের মধ্যে দানা বেধে উঠে। এই অবস্থাকেই 'নাফসে লাউয়্যামাহ' বলা হয়।

তারপর অনুশোচনা, অনুতাপ ও আফসোসের ঘাত-প্রতিঘাতে মনের মাঝে পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি হয়। মনের গহিন অন্দর হতে পাপ-চিন্তা ধুয়ে-মুছে লীন হয়ে যায়। এভাবে পাপ-প্রবৃত্তির অবসান ঘটে ও মনের মাঝে পুণ্যাশ্রয়ী ভাবপ্রবণতা মুক্ত ও পবিত্রতার অঙ্গণে বিচরণ করে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভের জন্য উতলা হয়ে উঠে। এই অবস্থাকেই 'নাফসে মুতমায়িন্না' বা প্রশান্ত চিত্ত বলে অভিহিত করা যায়।

মোটকথা, রূহ এবং নাফসের মাঝে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। রূহ নূর হতে উৎসারিত। আল্লাহ পাকের ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি। সর্বদাই তারা আল্লাহ পাকের বাধ্য থাকে। অবাধ্যতার লেশমাত্রও তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হয় না। তেমনিভাবে রূহও মানবদেহে অবস্থানকালে নূরানী পরিবেশ গঠনে তৎপর থাকে। আল্লাহ পাকের একান্ত বাধ্য হয়ে ফেরেশতা স্বভাবে নিজেকে বিভূষিত করতে চায় এবং নূরের রজ্জুকে ধারণ করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও কুরবত)قربة(হাসিল করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়।

রূহ এবং নাফসের পার্থক্য নির্দেশক একটি হাদীস খুবই গুরুত্ববহ। শরহে মোয়াত্তার ভূমিকায় হাফেজ ইবনুল বার (রাহঃ) এই হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ পাক স্বীয়কুদরতে হযরত আদম (আঃ)-কে পয়দা করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নাফস বা প্রবৃত্তি এবং রূহ আমানত রেখেছেন। তাই রূহানী শক্তি থেকেই পবিত্র চরিত্র, বিবেক-বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও সহনশীলতা, বদান্যতা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলি

অর্জিত হয়। কিন্তু নাফস বা প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হলো পাপাচার, ব্যভিচার, ক্রোধ, অহংকার, লোভ ও মোহকে শক্তিশালী করা ও চারিত্রিক দুর্বলতার পথ খোলাসা করা।"

আমরা জানি, সৃষ্টজগতের প্রতিটি বস্তুরই পরিপুষ্টির জন্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন হয়। আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারাই দেহ সতেজ হয়, শক্তিশালী হয় ও পুষ্টি লাভ করে। এ দ্বারা নাফস বা প্রবৃত্তি শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং রূহানী শক্তিকে নিজের আয়ত্তে রাখতে চায়। কিন্তু রূহের পরিপুষ্টি আহার্য, পানীয় ও বায়ুর দ্বারা সাধিত হয় না। রূহের খাদ্য ও পুরিপুষ্টির একমাত্র উপাদান হচ্ছে 'আল্লাহর জিকির' বা আল্লাহর স্মরণ। সুতরাং আল্লাহর জিকির বা স্মরণের মাধ্যমে রূহ যখন পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন দৈহিক শক্তি বা প্রবৃত্তি তাকে অধীনস্ত করতে পারে না; বরং প্রবৃত্তি বা নাফস রূহের অধীনস্ত তাবেদার হিসেবে দেহের মাঝে অবস্থান করে।

রূহের অস্তিত্ব:

রূহের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। রূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে চির ভাস্বর সত্যকে মিথ্যার বেড়াজালে আচ্ছন্ন করা। قل الروح مِنْ أَمْرَ رَبِّي অর্থাৎ বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশ ঘটিত (১৭:৮৫) এই কথা হতে রূহের অস্তিত্বকে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কুরআনে হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম যা উল্লেখ করেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি রূহের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেনঃ

(ক) "মানবদেহে যে রূহ রয়েছে তা' চোখে দেখা যায় না, তবে সে বস্তুটির কারণেই আমরা জীবিত রয়েছি। যদি তা না থাকে তাহলে আমাদের মৃত্যু হয়। এ বস্তুটির নাম হলো রূহ। যতক্ষণ রূহ মানবদেহে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণই মানুষের অস্তিত্ব বিরাজমান থাকে। যদিও মানুষের বিবেক বুদ্ধি রূহের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন তার শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু রূহানী শক্তি তখন বৃদ্ধি পায়। মানুষ তখন স্বপ্নে অনেক দৃশ্য দেখে এমনকি পারলৌকিক জীবনের অনেক বিষয় সম্পর্কেও অবগত হয়। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, দৈহিক শক্তি বেকার হওয়ার পর যে বস্তুটি মানুষকে পরজগতের দৃশ্য দেখায় তাহলো রূহ।

(খ) মহান আল্লাহ পাক আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِیْ سَبِيْلِ اللهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

অর্থাৎ "যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, কেননা, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা জান না।" (২:১৫৪)। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শহীদগণ জীবিত বরং চিরঞ্জীব। তাদের মৃত বলা বৈধ নয়। অথচ তাদের দেহ মৃত্যুবরণ করেছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু মানবদেহকে পূর্ণ মানুষ বলা যায় না। তার মধ্যে থাকে অন্য আর একটি বস্তু, তারই নাম রূহ।

(গ) এমনিভাবে একথা সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত যে, মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হয় এবং জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রেরণ করা হয়। অথচ এসব অবস্থায় মানবদেহ মৃতই থাকে। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, দেহ ব্যতীত মানুষের আরো একটি পরিচয় আছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে রূহ দেখা যায় না, কিন্তু দেখা না যাওয়া তার অস্তিত্ব না থাকার প্রমাণ নয়। আমরা ইথার বা তরঙ্গকে দেখি না, এতদসত্ত্বেও তার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করি। এমনিভাবে আমরা ফেরেশতাগণকে দেখি না, কিন্তু ফেরেশতাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি না। ঠিক এমনিভাবে মানবদেহে রূহ রয়েছে, অথচ আমরা তা দেখি না।

এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়া খুবই স্বাভাবিক, আর তা হলো রূহের অবস্থান কোথায়? দেহ কাঠামোর কোন অংশে বা কেন্দ্রে রূহ অবস্থান করে? এ প্রশ্নের জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ এবং আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত অভিমত হলো এই যে, রূহ মানবদেহের সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান থাকে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ:

(قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)

অর্থাৎ "বল, রূহ আমার প্রতিপালকের নির্দেশ ঘটিত(১৭:৮৫)।" আল্লাহ পাকের নির্দেশ যার উপর পতিত হয় বা যার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, তা ষোলো আনাভাবে সর্বত্রই সমভাবে প্রযোজ্য হয়। এই নির্দেশ থেকে ব্যক্তি, বস্তু বা জীবনের কোনো অংশ খালি থাকে না বা এর বাইরে অবস্থান করে না। তাই একথা সুস্পষ্ট বলা যায় যে, মানবদেহের প্রতিটি অংশে, প্রতিটি কোষে, প্রতিটি গ্রন্থিতে রূহ একইভাবে বিরাজমান থাকে। যে সকল অঙ্গ মানবদেহের জরুরি প্রয়োজন মিটায় যেমন হাত, পা, চোখ ইত্যাদি, এগুলোর একটি বা একাধিক অঙ্গ না থাকলে বা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে রূহ আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক দেহের অন্যান্য অংশে অবস্থান করে। রক্ত সঞ্চালন, তাপ বা বাতাসের উপর, নিশ্বাস প্রশ্বাসের উপর রূহ নির্ভরশীল নয়। রূহ আল্লাহ পাকের আদেশ কোনো কিছুর উপর নির্ভরশীল হতে পারে না বলেই রূহের অস্তিত্ব সত্য এবং সৃষ্ট বস্তুর বহু পূর্বেই রূহের অস্তিত্ব ছিল। ব্যক্তি বা বস্তু বা পদার্থের মাঝে রূহের বিচ্ছুরণ হয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক।

আত্মার পবিত্রতা কি:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىہَا
وَ قَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىہَا

অর্থ: "সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"
(সূরা শামস-৯,১০)

তাজকিয়া হলো (আরবি: تزكية) ইসলামিক পরিভাষা, সংক্ষেপে তাজকিয়া আল নাফস যার অর্থ 'আত্মশুদ্ধি'। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে নফস (আত্মপ্রবৃত্তি বা কামনা) কে প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক দশা থেকে পরিবর্তন করে শুদ্ধি ও আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের দশায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাজকিয়ার প্রকৃত রূপরেখা নীতিচরিত্র ও অভ্যন্তরীণ আমলের সংশোধন আত্মার পবিত্রতা বলতে সব ধরনের মন্দ স্বভাব দূর করে ভালো ও উত্তম গুণসমূহ দ্বারা অন্তরকে সজ্জিত করা। অন্তরের মন্দ স্বভাব হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অহংকার, লোক দেখানো প্রবণতা, কৃপণতা, কুধারণা প্রভৃতি। অন্তরের উত্তম গুণগুলো হলো ইখলাস, সবুর, শোকর, আত্নসংযম, আল্লাহভীতি, আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, বদান্যতা, নম্রতা, ভদ্রতা, সততা ইত্যাদি।

তাযকিয়াতুন নাফস-এর বিশুদ্ধ পথ:

নাফস পরিশুদ্ধ করা এবং তার অশিষ্ট চরিত্র ও প্রবণতাসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই করা ফারয। অতএব, এ গুরু কাজের যথার্থ ও বিশুদ্ধ পথ কী?- তাও জানা থাকা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। কারণ, এ কাজের সঠিক পথ জানা না থাকলে পদে পদে বিপথগামী ও সত্যচ্যুত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কার্যতও আমরা এ বিষয়ে অনেকের মধ্যে বহু বিভ্রান্তি লক্ষ্য করি। আমরা তাদেরকে ভুল পথে চলতে ও পরিচালিত হতে দেখতে পাই। তারা নাফসের পরিশুদ্ধি ও উন্নয়নের নামে এমন সকল 'আমাল করেন, একদিকে তা কোরআন ও হাদীসের ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও পরিচ্ছন্ন জীবন ব্যবস্থার পরিপন্থী, অপরদিকে তা তাদের নাফসের পরিশুদ্ধির জন্য যথার্থ ও কার্যকর ব্যবস্থাও নয়। ফলে দেখা যায় যে, এ সব 'আমালের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থে তাদের নাফস পরিশুদ্ধ তো হয় না; বরং উল্টো তাদের নাফস আরো কলুষিত ও বলবান হয়, সুন্দর ও সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত হবার পরিবর্তে মন্দ ও অশিষ্ট বৃত্তিসমূহই বিকাশ লাভ করে।

অনেক 'আলিম ও শাইখই নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ অন্তরের লোক মনে করেন এবং দাবি করেন যে, তাঁরা লোকদের নাফসের তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধির কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো- বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁদের আচার- আচরণ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তাঁদের মধ্যে অনেকের নিজেদের নাফসই কলুষিত ও রোগগ্রস্ত। তাঁরা হিংসা-বিদ্বেষ, গর্ব-অহঙ্কার, পার্থিব মোহ, লোভ- লালসা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি আত্মিক ব্যাধিসমূহে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। অতএব, যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘ সাধনার পরেও তাঁদের নিজেদের নাফসকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হননি, তা হলে তাঁরা কীভাবে তাঁদের শিষ্যদের নাফসের সংশোধন করবেন, তাদের অন্তরের ব্যাধিসমূহের জন্যই বা কী ব্যবস্থাপত্র দেবেন? বিশিষ্ট 'আবিদ ফুদাইল ইবনু 'ইয়াদ [১০৫-১৮৭হি.) (রাহ.) বলেন,

الْعَالِمُ طَبِيبُ الدِّينِ وَدَوَاءُ الدُّنْيَا فَإِذَا كَانَ الطَّبِيبُ يَجُرُّ الدَّاءَ إِلَى نَفْسِهِ فَمَتَى يُبْرِئُ غَيْرَهُ؟

'আলিম হলো দীনের চিকিৎসক ও দুনিয়ার প্রতিষেধক। অতএব, চিকিৎসক যদি নিজেই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তা হলে সে অন্য লোককে কীভাবে সুস্থ্ করে তোলবে?

জনৈক কবি কতোই চমৎকার বলেছেন,

وَغَيْرُ تَقِي يَأْمُرُ النَّاسَ بِالتَّقَى ...طبيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ سَقِيمُ.

মুত্তাকী নয়- এমন ব্যক্তি লোকদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়। এরূপ ব্যক্তির উদাহরণ হলো ঐ চিকিৎসক, যে নিজে রোগাক্রান্ত; কিন্তু লোকদের চিকিৎসা করে চলেছে।

তাযকিয়াতুন নাফসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

যদি কেউ কামনা করে যে, সে আল্লাহর একান্ত খাঁটি ও প্রিয় বান্দাহতে পরিণত হবে এবং তার নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে, তা হলে তাকে অবশ্যই তার নাফসের মন্দপ্রবণতাগুলো দূরীভূত করতে হবে এবং তার যাবতীয় অশিষ্ট চরিত্রসমূহ সংশোধন করতে হবে। তবেই তার মধ্যে আল্লাহর প্রতি প্রবল আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে একটি নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে এবং তার আচার-আচরণ হবে অত্যন্ত পরিশীলিত ও মার্জিত। এতে যেমন তার পার্থিব জীবন সুন্দর ও সুখ-সাচ্ছন্দ্যময় হবে, তেমনি তার পরকালীন জীবনও অত্যন্ত সুখ ও শান্তিময় হবে। নুবুওয়াতের চারটি মহান কর্তব্যের মধ্যে আত্মার পরিশুদ্ধকরণ অন্যতম।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِوتزكيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

- "তিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। "
(আল-কুর-আন, সূরা আলু-'ইমরান, ৩: ১৬৪; সূরা আল-জুমু'আহ, ৬২: ২
সূরা আল-বাকারাহ, ২: ১২৯)

কাজেই নাফস পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দীনের একটি অতি অপরিহার্য কর্তব্য ও সর্বাপেক্ষা বড় 'জিহাদ। ইসলামের সকল 'আলিমের মতে, নাফস পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা ফারযে 'আইন। কেননা নাফস অপরিশুদ্ধ ও কলুষিত হলে বান্দাহর কোনো 'আমালই নির্দোষ ও পবিত্র হবে না। এরূপ অবস্থায় 'আমাল করার অর্থ হলো ময়লাযুক্ত শরীরে সুন্দর ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান করার মতোই। ধরুন, সালাত একটি শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। কিন্তু কেউ যদি এ সালাত লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আদায় করে, তবে তার এ 'ইবাদাত কবূল তো হবেই না; বরং তা ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত হবে এবং এ জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর রাস্তায় শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা একটি শ্রেষ্ঠ 'ইবাদাত। কিন্তু কেউ যদি এ জিহাদ সুখ্যাতি অর্জন কিংবা গানীমাত লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে করে, তার এ প্রাণপণ সংগ্রামও কবুল হবে না; বরং তা ছোট শিরকের পর্যায়ভুক্ত

হবে এবং এ জন্য সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنْ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ .قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي
النار .....

'কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে (দৃশ্যত আল্লাহর পথে লড়াই করতে করতে) শাহাদাত বরণ করেছিল। তাকে (বিচারের জন্য) হাযির করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর প্রদত্ত নি'মাতসমূহের কথা জানিয়ে দেবেন। লোকটি তা স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করবেন, এর বিনিময়স্বরূপ তুমি কী 'আমাল করেছিলে? লোকটি জবাব দেবে, আমি আপনার পথে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি লড়াই করেছিলে বীররূপে সুখ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে। আর (দুনিয়ায়) তুমি সেই খিতাব পেয়ে গেছো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাকে উপুড় করে টেনে-হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।
(মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাব: আল ইমারাহ), হা. নং: ৫০৭২)

মোট কথা, নাফসের পরিশুদ্ধি ছাড়া কারো পক্ষে সত্যিকার অর্থে দীনের বিধি- বিধান প্রতিপালন করা, দীনের ওপর অটল ও অবিচল থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব নয়। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য জায়গায় নাফসের মন্দ প্রবণতা দূরীকরণ ও তাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও প্রায়ই আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁর নাফসের পরিশুদ্ধি কামনা করে দু'আ করতেন। তিনি বলতেন,

اللهم آتِ نَفْسي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

হে আল্লাহ! আমার নাফসে সংযম শক্তি দান করুন! তাকে পরিশুদ্ধ করুন! আপনিই হলেন নাফসের সর্বোত্তম পরিশুদ্ধি দানকারী। আপনিই এর মালিক ও অভিভাবক।

মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাব: আয-যিকর...), হা. নং: ৭০৮১

কাজেই যদি কারো নাফসের মন্দ প্রবণতা দূরীভূত করা না হয় এবং তার নাফসের মধ্যে পশুত্বসুলভ ভাব ও চরিত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে তার পক্ষে যথার্থরূপে দীনের বিধি-বিধান প্রতিপালন তো সম্ভবই নয়; বরং এ আশঙ্কাও বিদ্যমান রয়েছে, সে যতটুকু দীনের বিধিবিধান পালন করে, তা পণ্ডশ্রম হবে ও বিফলে যাবে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে,

আল্লাহ তা'আলা বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاهَا .وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"যে নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজের নাফসকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"(আল কোরআন, সূরা আশ্ শাম্স, ৯১: ৯-১০)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله عز وجل، وقد خاب من دساها قال :من أهلكها وأضلها وحملها على معصية الله.

যে নিজের নাফসকে পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করতে পেরেছে এবং তাকে আল্লাহর 'ইবাদাতে নিয়োজিত করতে পেরেছে, সে-ই সফল হয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নাফসকে ধ্বংস করলো, বিপথগামী করলো এবং তাকে আল্লাহর নাফরমানীর কাজে নিয়োজিত করলো, সে ব্যর্থ মনোরথ হলো। (বাগাতী, মা'আলিমুত তানযীল, খ. ৮, পৃ. ৪৩৯; ছা'লাবী, আল-কাশফু ওয়াল বায়ান, খ. ১০, পৃ. ২১৪)

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দিয়ে বলেন,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى .فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

যে ব্যক্তি নিজের প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে
এবং নাফসকে কুপ্রবণতা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে, তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত। (আল কোরআন, সূরা আন-নাযি'আত, ৭৯: ৪০-৪১)

আত্মার পবিত্রতা দিক:

আত্মার পবিত্রতা দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত আত্মার ময়লা পরিস্কার করা। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় মন্দ অভ্যাসগুলো সংশোধন করা। দ্বিতীয়ত; পছন্দনীয় গুণাবলি অর্জনের জন্য আত্মিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। এছাড়া আত্মার পবিত্রতার প্রথম দিক (আত্মার ময়লা পরিষ্কার) করার কথা বলা হয়েছে সেগুলো হলো: গীবত, পরনিন্দা, আল্লাহর প্রতি কুধারণা, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, রিয়া, কৃপণতা এই মন্দদিককে সংশোধন ও পরিমার্জন একান্তই অপরিহার্য। নতুবা আত্মাকে পবিত্র করা সম্ভব নয়। এগুলো আত্মিক রোগব্যাধি যার সংশোধন করার মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করা সম্ভব।

মানব শরীর কীসের সমন্বয়ে সৃষ্টি:

মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দুটি জিনিস দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দেহ ও আত্মা। এদুটি জিনিস সুস্থ থাকলে মানুষকে পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ বলা হয়। মানুষের যেমন দৈহিক রোগব্যাধি আছে তেমনি আছে আত্মিক রোগব্যাধি। দৈহিক রোগব্যাধির জন্য আমরা চিকিৎসা গ্রহণ করি। তেমনি আত্মিক রোগব্যাধিরও চিকিৎসা প্রয়োজন। আত্মার সুস্থতার ওপর দেহের সুস্থতা নির্ভর করে।
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
"মানবদেহে একটা টুকরা আছে, যেটি ঠিক থাকলে গোটা দেহ ঠিক থাকে আর সেটি নষ্ট হলে গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যায়। তার নাম 'অন্তর'।" (সুনানে তিরমিজি, ২০১৪)

সুতরাং অন্তরে উৎসারিত যাবতীয় কামনা-বাসনা ও আবেগ উচ্ছ্বাস সুন্দর না হলে মানুষের গোটা জীবনই নষ্ট হয়ে যায়।

তাজকিয়ার গুণ:

তাজকিয়াতে তিনটি গুণের আলোচনা কুরআনুল কারীমে এসেছে। তার একটি হলো, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

অর্থ: যারা যাকাত দান করে থাকে।
(সূরা মু'মিনুন, আয়াত ৪)

এখানে, যাকাত দানে সক্রিয়, যাকাত বলতে বিদ্বানগত দুটি দিক বর্ণনা করা হয়েছে।
(ক) যাকাত যা সম্পদের যাকাত দ্বারা উদ্দেশ্য।
(খ) নাফসের যাকাতা, নাফসের যাকাত হলো শিরকী, বিদাতি বিশ্বাস থেকে নিজেকে মুক্ত, পাপ কাজে না জড়ানো। সর্বদা আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করা।
অপর দুইটি গুণ হলো খুশুর সাথে সালাত আদায় ও বাজে কাজ ও বাজে কথা থেকে বেঁচে থাকা।

অন্তরের আমল:

অন্তরের আমল দু'ধরনের। একটি অন্তরের হালাল আমল, অপরটি অন্তরের হারাম আমল।

•অন্তরের হালাল আমল:

(ক) ইখলাস:

ইখলাস অন্তরের একটি আমলের নাম। হাত, পা, জবান দ্বারা এ আমল করা যায় না। এর স্থান হলো অন্তর। সুতরাং আত্মিক আমল, যা অর্জন করা নামায, রোযার মতোই ফরয।

(খ) সবর:

সবর অর্থ বিপদে-আপদে, রোগে-শোকেমনে এ চিন্তা করা যে, আমি আল্লাহ তায়ালার ফয়সালায় সন্তুষ্ট। তিনি আমাকে যা দান করেন তাই আমার জন্য কল্যাণকর।

(গ) শোকর:

নেয়ামতরাজির উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা। আমি এই নেয়ামতের যোগ্য নই, তবুও আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমাকে দান করেছেন। তাই তাঁর শোকর আদায় করা উচিত।

•অন্তরের হারাম আমল:

(ক) অহংকার:

অহংকার করা, নিজেকে বড় মনে করা, অহমিকা দেখানো, অন্যদের ছোট এবং তুচ্ছজ্ঞান করা। অহংকার একটি কঠিন রোগ। আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মতো হারাম। কেননা অহংকার ও বড়ত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার শান।

(খ) হিংসা:

হিংসা একটি আত্মিক ব্যাধি যা হারাম। কারো মাঝে কোনো নেয়ামত দেখার পর অন্তর আনচান করে উঠে, নেয়ামতটি সে পেল, আমি পেলাম না। নেয়ামতটি তার কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাক, এরূপ চিন্তাই হিংসা।

বাহ্যিক আমলের মতো আত্মিক আমলও দুই প্রকার- ফরয ও হারাম। ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোর উপর আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং হারামগুলো থেকে আত্মাকে নিরাপদ নাম রাখার নামই হলো তাজকিয়াতুন নফস বা আত্মার পবিত্রতা।

আত্মার শোভা:

যেমনিভাবে মানুষের দেহ সুন্দর ও সুশ্রী হয়- বলা হয়ে থাকে অমুক দেখতে খুব সুন্দর। হরিনীর চোখের মতো চোখ ইত্যাদি। তেমনিভাবে আত্মারও সৌন্দর্য আছে, সুশ্রী ও সুবাসিত আত্মা সেটি যার মধ্যে বিনয়, ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতার গুণ আছে। যে আত্মা কামনার দাস নয়, প্রদর্শনমুখী নয়, সে আত্মাই সুন্দর আত্মা।

তাজকিয়ার মূল:

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবি রাহিমাহুল্লাহ অত্যন্ত চমকপ্রদ কথা বলছেন, যা ভালোভাবে স্মরণ রাখার মতো। তিনি বলেছেন, "তাজকিয়ার মূল কথা হলো- যখন কারো অন্তরে শরিয়তের কোনো বিধিবিধান পালনে উদাসিনতা সৃষ্টি হয়, তখন তার বিরোধিতা করা। যেমন নামাজের সময় হয়ছে, কিন্তু নামাজে উপস্থিত হতে অলসতা লাগছে। এই অলসতাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নামাজের বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। তদ্রুপ গুনাহ বর্জন করার ব্যাপারেও যদি উদাসীনতা আসে তখন গুনাহ বর্জন করে নফসের বিরোধিতা করা।

আত্মার পবিত্রতা নষ্ট হয় কি? :

হ্যাঁ, আত্মাও কলুষিত হয়। আত্মা কলুষিত হওয়ার কারণসমূহ:

(ক) কুদৃষ্টি:

আত্মাকে কলুষিত করার প্রধান কারণ হলো কুদৃষ্টি। যা শয়তানের বিষাক্ত তীর। আশরাফ আলী থানবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন," কোনো পরনারীর প্রক্তি দৃষ্টিপাত করে নফস তোমাকে প্রবঞ্চিত করতে চাইবে। বলবে, একবার দেখে নাও, এতে ক্ষতি কিসের? বুঝে নিবে, এটা নফসের প্ররোচনা। সুতরাং নফসের ডাকে সাড়া না দিয়ে তার আশা ধুলোয় মিশিয়ে দিবে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"আপনি মুমিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে আর তাদের যৌনাঙ্গকে হেফাজত করে।"
(সূরা নূর, আয়াত ৩০)

(খ) হারাম ভক্ষণ:

আল্লাহ বলেন,
"বলুন, অপবিত্র ও পবিত্রতা সমান হতে পারে না। যদিও অপবিত্রতার আধিক্য আপনাকে অভিভূত করে। হে জ্ঞানীগণ, আল্লাহকে ভয় করে চলো, যাতে করে তোমরা সফল হয়ে পারো।"
(সূরা মায়িদা, আয়াত ১০০)

হারাম ভক্ষণ যদিও ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় হোক না কেন, অন্তরে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় ও দুয়া কবুল হয় না।

(গ) কুচিন্তা:

মোটাদাগের গুনাহগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা রাখি বিধায় আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া যে আমরা সেগুলো করি না। যেমন: মদ পান করা, শুকুর না খাওয়া, ব্যভিচার না করা। কিন্তু এমন অনেক গুনাহ আছে, যা গুনাহ মনে করি না আমরা। যেমন: পরনিন্দা, চোগলখোরি, কুধারণা ইত্যাদি। এর ফলে আমাদের অন্তর বিষাক্ত হয়। কিন্তু আমরা তো এটাকে গুনাহ-ই মনে করি না।

(ঘ) চোখ, কান ও জবানকে লাগামহীন করা:

মাওলানা রুমি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, "চোখ বন্ধ করো। অর্থাৎ অবৈধ স্থানে চোখের গুনাহ করো না। কানকে বন্ধ করো। অর্থাৎ গুনাহর কথা শোনা থেকে কানকে নিরাপদ রাখো। ঠোঁটকে বন্ধ করো। অর্থাৎ ভুল কথা মুখ থেকে বের করো না। এই তিনটি

যেমন গান শোনা, গীবত, মিথ্যা কথা শোনা থেকে কানকে হেফাজত করে। এই তিনটি কাজ করার পর যদি আল্লাহ তায়ালার নূর না দেখো তাহলে আমাকে নিয়ে উপহাসের হাসি হেসো।"

সুতরাং চোখ, কান, জবানকে হেফাজত করার মাধ্যমে আত্মাকে হেফাজত করা যায়। আর এই তিনটির লাগামহীনতার কারণে অন্তর কলুষিত হয়ে যায়।

অন্তর কলুষিত হওয়ার লক্ষণ:

(ক) লজ্জা ভয় শেষ হয়ে যাওয়া:

যেমন স্ত্রী বলে উঠল,'এতো দেরি করে বাসায় আসো কেন?' স্বামী বলল,'আমার কাজ আছে, তোমার কি? তুমি জিজ্ঞাসা করার কে?'ছেলে বলে,' আব্বু জানলে কি হয়ছে? কে আমার কি করবে?'-মোট কথা অন্তরের ভয় শেষ হয়ে যায়।

(খ) নেক কাজকে বোঝা মনে করা:

যেমন, নামায পড়তে মন চায় না। মসজিদে আসতে মন চায় না। নেক লোকদের সাথে মিশতে মন চায় না। ওয়াজ মাহফিলে আসতে মন চায় না। কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতে মন চায় না। নেক কাজও বোঝা মনে হয়।

(গ) উপদেশদাতাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করা:

যেমন, কেউ যখন বোঝায়, তখন তাকে অত্যন্ত খারাপ মনে হয়। মা-বাবাও যদি বোঝায়, বলে আমাকে বোঝায় কেন? স্বামী বলে স্ত্রী আমাকে কেন বোঝায়। যে বোঝায় সে তো আমার কল্যাণকামী, কিন্তু অন্তর যখন কালো হয় তখন হিতাকাঙ্ক্ষীকেও শত্রু বলে মনে হয়।

অন্তর আলোকিত হওয়ার লক্ষণ:

চেহারায় নূর থাকা, যে কোনো আমল করবে, আল্লাহ তায়ালা তার চেহারায় নেকির নূর সাজিয়ে দিবেন। চেহারা দেখে মানুষ শান্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ হবে। আল্লাহ ওয়ালাদের চেহারায় এই আলামত থাকে।

অন্তরে শান্তি ও আনন্দ থাকা:

যেই অবস্থায় থাকুক, বিপদ আপদ দু:খ কষ্ট সর্বাবস্থায় অন্তরে প্রশান্তি ও আনন্দ থাকে। পেরেশানি ও হতাশা থাকে না।

কাজে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য থাকা:

যে কাজই করুক তাতে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য থাকে। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সবকিছুর ব্যবস্থা হয়। আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়ার ঝামেলায় লিপ্ত করেন না। তাই আমাদের উচিত গুনাহের জীবন ছেড়ে নেকির জীবন অবলম্বন করা।

আত্মার পবিত্রতার মাহাত্ম্য:

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-
"জেনে রাখো, মানবদেহে একটি গোশতপিন্ড আছে, যা সুস্থ হলে গোটা মানবদেহ সুস্থ আর অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ দেহ নষ্ট হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে 'রূহ বা আত্মা'।"
এখানে গোশতপিন্ড দ্বারা সাধারণ গোশতের টুকরা উদ্দেশ্য নয়। কারণ রূহ অপারেশন করলে তার মধ্যে অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ এগুলো পরিলক্ষিত হবে না। ডাক্তার হৃদয়ের বহিঃভাগ চেক করে হয়তো বলতে পারবেন তার হৃদয়স্পন্দন ঠিক আছে কিনা। শিরা যথাযথ কাজ করছে কিনা। চেকআপ কিংবা যন্ত্রের সাহায্যে হৃদয়ের বাহিরের দিকটা বোঝা গেলেও অভ্যন্তরীণ দিকটা দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। মূলত অন্তর মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী আল্লাহ তায়ালার একটা সৃষ্টি। মানুষের বাহ্যিক জীবনের উপর নির্ভর করে।

দৈহিক সুস্থতা যে অন্তরের উপর নির্ভরশীল এটা সব মানুষই জানে। মানুষের অন্তর ততক্ষণ পর্যন্ত সচল থাকে যতক্ষণ সে জীবিত থাকে। এই অন্তর মানুষের জন্মের শুরু থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং আমরণ নিজের কাজ করে যায়। তার কোনো ছুটি নেই, বিরাম নেই। তার কাজ হলো প্রতি মিনিটে বাহাত্তর বার গোটা দেহে করে এবং তারপর ফিরিয়ে নেয়। এ কাজ থেকে সে কখনো নিষ্কৃতি পায় না। অথচ দেহের অন্যান্য অঙ্গের স্থিরতা আছে। যেমন মানুষ ঘুমালে চোখ শান্ত থাকে, কান স্তব্ধ হয়। দেহের অন্যান্য যাবতীয় অঙ্গ কিছু সময়ের জন্য আরাম পায়। কিন্তু এই অন্তর বা প্রাণের কোনো স্থিরতা নেই। তাকে সবসময় চঞ্চল থাকতে হয়। এমনকি অচেতন অবস্থাতেও সে নিজের দায়িত্ব পালন করে যায়। এর কারণ হলো যেদিন এই অন্তর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে, সেদিন মানুষের জীবন শেষ হয়ে যাবে। সে তখন মারা যাবে।

তাযকিয়া বা আত্মার পবিত্রতার মূল হলো চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির পথ দেখানো। যেমনিভাবে ফকিহগণ মানুষের বাহ্যিক আমল যেমন, নামায, যাকাত, রোযা ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট মাসয়ালা মাসায়েল বিধিবিধান বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে, সুফিগণ অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের বিশ্লেষণ দান করেন। কুরআনুল কারিমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব ছিলো মানুষের অপবিত্র আত্মাকে পবিত্র করে তোলা। এবিষয়টিকে আলোচ্য আয়াতে এভাবে বিবৃতি করা হয়েছে-

আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মু'মিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝ থেকে একজন ব্যক্তিকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর কিতাবের আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন, অথচ তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। (আল কোরআন, সূরা আলে 'ইমরান, ৩: ১৬৪)

আত্মার পবিত্রতা কেন প্রয়োজন:

অনেকে মনে করেন, তাযকিয়া বা আত্মার পবিত্রতা শরিয়তের বহির্ভূত কোনো বিষয়। জেনে রাখুন, তাযকিয়া বা আত্মার পবিত্রতা ইসলামি শরিয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দৃশ্যমান যাবতীয় কাজের বিধি বিধান তো শরিয়ত। আর অদৃশ্যমান সমস্ত কাজের সমষ্টি হলো তরীকত। আত্মার পবিত্রতা না হলে দৃশ্যমান সকল কাজই অনর্থক। যথা ইখলাস একটি অদৃশ্য আমল।

ইখলাস বলা হয় প্রত্যেক কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে একমাত্র আল্লাহর জন্যই সকল কাজ করা। কারো মনে ইখলাস না থাকলে তার নামাযও অনর্থক। কেউ হয়তো নামাজ পড়ে যেন মানুষ তাকে মোত্তাকি পরহেজগার বুজুর্গ ধারণা করে। তাহলে এই ব্যক্তির দৃশ্যমান নামাজ তো ঠিক আছে কিন্তু ইখলাস না থাকার কারণে এই ঠিক থাকা মূলত ঠিক থাকা নয় বরং তার নামাজও তখন ব্যর্থ হবে উপরন্ত গুনাহ হবে হাদিস শরীফে আছে,
"যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ে আল্লাহর সঙ্গে শিরক স্থাপন করে। কারণ সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাখলুককে খুশি করার তালে মত্ত। কাজেই বাহ্যিক অবস্থা দুরস্ত করার চেয়েও আত্মিক অবস্থা শুদ্ধ করার গুরুত্ব বেশি। এমন না হলে বাহ্যিক আমল ব্যর্থতাই পর্যবসিত হবে"।

আত্মার পবিত্রতা অর্জনের উপায়:

আবু আব্দুল্লাহ নোমান বিন বাশির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,"নিশ্চয়ই হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট এদের মধ্যে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয় বেশিরভাগ মানুষ সেগুলো জানে না। অতঃপর যে ব্যক্তি সন্দেহ জনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে সে নিজের দ্বীন ও সম্মানকে ত্রুটিমুক্ত রাখে। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কাজে লিপ্ত হলো সে হারামে লিপ্ত হলো।
সাবধান! নিশ্চয়ই মানবদেহে একখণ্ড গোস্তের টুকরা আছে যখন তা সুস্থ হয়ে যায় গোটা শরীরটাই সুস্থ হয়ে যায় এবং যখন তা অসুস্থ হয়ে যায় গোটা শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো, এটাই হল 'কলব'।"
(সহিহ মুসলিম)

আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মার পবিত্রতা তাগিদ দিয়েছেন। আত্মা পবিত্র না হলে মানুষের জীবনের কোন কিছু সুন্দর ও সুস্থভাবে পরিচালিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন সেই সফল যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে এবং যে তার আত্মাকে কলুষিত করেছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত।
(সূরা-শামস, আয়াত ৮-৯)

আত্মার পবিত্রতা অর্জনের উপায়:

(ক) অন্তরের পবিত্রতার জন্য দোয়া করা:

অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর বিধান পালনে তার দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আবশ্যক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন, "হে অন্তর পবিত্র পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দেন।"
(মুসনাদে আহমাদ)

(খ) অন্তরের ব্যাধির ব্যাপারে উদাসীন না হওয়া:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন," নিশ্চয়ই মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মধ্যে অবস্থিত, তিনি তা যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।"
(সহীহ মুসলিম)

(গ) পরকালকে ভয় করা:

আত্মার পবিত্রতা ছাড়া কিয়ামতের দিন কোন কিছুই তার উপকারে আসবে না। সুতরাং পরকালের ভয় অন্তরে উপস্থিত রাখতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আজ সম্পদ ও সন্তান কোন উপকার করতে পারবে না, কেবল যে পরিশুদ্ধ আত্মা নিয়ে আল্লাহর কাছে আসবে।"
(সূরা শুয়ারা, আয়াত ৮৮-৮৯)

কলবুল সালিম, তা হলো শিরক ও বিদআত সহ অন্যান্য ব্যাধি ও অপছন্দনীয় বস্তু থেকে পবিত্র আত্মা। ফলে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় ও মহব্বত ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

(ঘ) অন্তরের সুস্থতার জন্য দোয়া করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মশুদ্ধির জন্য নিয়মিত দোয়া করতেন। তাই আলেমরা আত্মার পবিত্রতার জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব বলেছেন। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া ছিলো, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্থ কলব কামনা করছি।"
(মুসনাদে আহমাদ)_
-
(ঙ) কোরআন সুন্নাহে বর্ণিত আত্মার পবিত্রতার পদ্ধতি অবলম্বন করা:

আত্মশুদ্ধির বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের আহ্বান জানিয়ে কোরআনে বলা হয়েছে,
"হে মুমিনরা, রাসূল যখন তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদের প্রাণবন্ত করে তখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিবে। আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যবর্তী হয়ে থাকেন।" (সূরা আনফাল, আয়াত ২৪)

(চ) আল্লাহর স্মরণ অন্তর নরম করে:

আল্লাহর জিকিরে মানব হৃদয় প্রশান্ত ও নরম হয়, এতে আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হয়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, "জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"
(সুরা রাদ, আয়াত ২৮)

(ছ) অসহায় মানুষের পাশে থাকা:

হাদিস শরীফে এসেছে," এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁর অন্তরের কঠোরতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, "যখন তুমি তোমার অন্তরকে নরম করার ইচ্ছা করবে তখন এতিমের মাথায় হাত বুলাবে এবং মিসকিনকে খানা খাওয়াবে। (মুসনাদে আহমাদ)

(জ) কবর জিয়ারত ও মৃত্যুর স্মরণ:

কবর জিয়ারত ও মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে অন্তর আল্লাহমুখী হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "ইতোপূর্বে আমি তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত করো। কেননা নিশ্চয়ই তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্তরের উন্নতি ঘটায়।" (মুসনাদে আহমাদ)

(ঝ) অন্তরের কঠোরতা পরিহার:

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা একাধিক স্থানে কঠোর হৃদয়ের নিন্দা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "দুর্ভোগ সে কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য যাঁরা আল্লাহর জিকির হতে পরামুখ। তারা স্পষ্টত বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা জুমার, আয়াত-২২)

(ঞ) কলুষিত আত্মার পরিনতির কথা স্মরণ করা:

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কলুষিত আত্মার পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন।

"সাবধান! নিশ্চয়ই মানবদেহে একখন্ড গোশতের টুকরো আছে, যখন তা সুস্থ হয়ে তখন গোটা শরীরটাই সুস্থ হয়ে যায় এবং যখন তা অসুস্থ হয়ে যায় গোটা শরীরটাই অসুস্থ হয়ে যায়। জেনে রেখো এটা হচ্ছে 'কলব'।"' (সহিহ মুসলিম)

ইসলামের রোকন ও আত্মার পবিত্রতা

* সালাত আত্মার পবিত্রতা ও নৈতিক উৎকর্ষ অর্জনের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা:

মানুষ অনেক বিষয়ের প্রশিক্ষণ পায় সালাতের মাধ্যমে। মানুষের বেয়াড়া প্রবৃত্তির লাগাম টেনে ধরা এবং নাফসকে সংশোধিত ও দীপ্তিময় করার সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো সালাত। সালাতে নাফসকে বিনম্র ও অহঙ্কারমুক্ত করার অনুশীলনের ফলে কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠার সুযোগ পায় না এবং খারাপ অভ্যাসও নামাযীর আচার-আচরণে স্থান পায় না। এভাবে পরিশুদ্ধ হবার পর নামাযী সমাজকেও কল্যাণ ও উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا .إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا

(الْمُصَلِّينَ .الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

মানুষকে খুবই অস্থিরচিত্ত দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে বিপদগ্রস্ত হলে হা-হুতাশ করতে থাকে এবং ঐশ্বর্যশালী হলে কৃপণ হয়ে পড়ে, তবে তারা নয়, যারা সালাত আদায় করে, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান। (আল কোরআন, সূরা আল-মা'আরিজ, ৭০: ১৯-২৩)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَ

"আর সালাত কায়িম করো। নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে বিরত রাখে। "(আল কোরআন, সূরা আল-'আনকাবুত, ২৯: ৪৫)

বলাই বাহুল্য, মানুষের নাফসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্নরূপ প্রবৃত্তি ও প্রবণতা। এ সব প্রবৃত্তি ও প্রবণতাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও ব্যবহার করা সম্ভব হলে মানুষ পরিপূর্ণতার চরম শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হবে। মানুষের সমস্যা হলো তারা অসচেতনতা বা উন্মত্ত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। প্রতিটি মানুষের ভেতরে যে উন্মত্ততা

থাকে, তাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। মহান আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। সালাতে আল্লাহর স্মরণ শাণিত ও প্রদীপ্ত হয়। মানুষ যখন সালাত আদায় করে, তখন তার ভেতরের সতর্ককারী বিবেক সজীব বা প্রাণবন্ত হয়। এ বিবেক তাকে বারংবার অশ্লীলতা ও অন্যায়ের ব্যাপারে সতর্ক করতে থাকে। এ বিষয়গুলোর উচ্চারণ ও পুনরাবৃত্তি নাফসকে বিনম্র ও ভীত-সন্ত্রস্ত রাখে। এ জন্য বারবার সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে। সালাত বার বার পড়তে হয়। সালাতের বিশেষ গুরুত্বটা এখানেই। সালাত নিয়মিতভাবে বিনয় ও মনোযোগসহ পড়া হলে শুধু নামাযীর নাফসই নয়, একই সাথে তার আশপাশের পরিবেশও কোমল, বিনম্র ও সুরভিত হয়। সমাজে প্রকৃত ও বিনম্র নামাযীর সংখ্যা যত বাড়বে, ততই স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা এবং অন্যায়-অবিচারের অন্ধকার কমে যাবে; বরং মুক্তি ও কল্যাণের আলো দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে প্রদীপ্ততর হয়ে ওঠবে।

যাকাতের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা লাভ হয়:

লোভ ও কৃপণতা মানুষের নাফসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ দুটি হচ্ছে নাফসের সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং নিকৃষ্ট স্বভাব, কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় জোরালো ভাষায় এ সবের নিন্দা করা হয়েছে। কৃপণ ও লোভী ব্যক্তিরা যাকাত দিতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা তাদের অন্তরাত্মাকে সংকীর্ণ এবং সঙ্কুচিত করে দেয়। পক্ষান্তরে যাকাত মানুষের এ অনুদার মনোভাবকে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, আর তার অন্তরকে করে দেয় সুপ্রশস্ত ও মহান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى .الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ-

"সে ব্যক্তি মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, যে যাকাত আদায় করে, অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন করে এবং বিপদাপদে লোকদের সাহায্য করে। "(তাবারানি আল মুজামুল কাবীর হা নং:৪০৯৬)

উল্লেখ্য, যে সব ব্যক্তি কৃপণতা ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারবে, তারাই সফলকাম।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

- وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ (وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"এবং ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। যারা
মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। "(সুরা আত তাগাবুন ৬৪:১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

- وَاتَّقُوا الشَّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ .مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

"তোমরা মনের কার্পণ্য থেকে বেঁচে থেকো। কেননা এটাই তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। "
(মুসলিম আস সহীহ হা নং :৬৭৪১)

বস্তুত যাকাতের ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল ধন-সম্পদের মধ্যেই সাধিত হয় না; বরং যাকাত দানকারীর মন-মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তা পরিব্যাপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتزكيهم بها -" তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। আর এর সাহায্যে আপনি তাদেরকে পূত-পবিত্র করে দিন।(আল কোরআন, সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১০৩)

সাওম আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সংযমের দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ:

রামাদানের সিয়াম সাধনা বস্তুত মানুষকে আলোকিত ও আদর্শ চরিত্র রূপে গড়ে তোলার একটা দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ। এর উদ্দেশ্য তাকওয়া অর্জন, আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও

আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। রামাদান শব্দের অর্থও দাহন বা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কিসের দাহন? মানব জীবনে প্রবৃত্তির দাহন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের মধ্যে দুটি স্বভাবগত বিষয় রয়েছে। এক. প্রবৃত্তি ও দুই. বিবেক-বুদ্ধি। বিবেক- বুদ্ধি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা সৃষ্টিতে এবং সমাজ জীবনে সংহতি, ঐক্য, প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টিতে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি মানুষকে অসংযত, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খলে পরিণত করে। কখনো এর অসংযত আচরণের ফলে মানুষ পশুত্বের চরম নিম্নস্তরে নেমে যায়। লোভ- লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও মোহ প্রভৃতি সামাজিক জীবনে চরম বিশৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। এ জন্য এ সব অসৎ গুণ ও স্বভাবকে দাহন করে নাফসকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা সিয়ামের প্রবর্তন করেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমারদের ওপর রোযা ফারয করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ওপর ফারয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।
(সুরা আল বাকারা আয়াত ১২৩)

তাকওয়ার প্রকৃত অর্থ হলো- সকল প্রকার অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। মানুষের মধ্যে যে সহজাত পাপপ্রবণতা রয়েছে রোযা মানুষকে এ পাপপ্রবণতা থেকে বিরত থাকতে শেখায়। একজন সত্যিকার রোযা পালনকারী কখনো অযথা ও বেহুদা কথা বলবে না, কখনো কোনো অন্যায় কাজ করতে পারে না।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি হজ্জ:

হাজ্জ হলো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি ও তাঁর নৈকট্য অর্জনের এক অনন্য কর্মশালা। হাজী ইহরাম বাঁধার সময় থেকেই এ নৈকট্য লাভের এক উর্বর পরিবেশ উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করে। সে ইহরামের সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরিধানের

মধ্য দিয়ে বাহ্যিকভাবে আড়ম্বরহীন একান্ত আল্লাহ প্রেমিক বান্দাহ হিসেবে নিজেকে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে পেশ করে। এটি তাকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শেখায়। এ সময় সে সমগ্র দুনিয়ার প্রাপ্তি প্রত্যাশার চাইতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্যকেই আরাধ্য জ্ঞান লাভ করে এবং তাঁর কণ্ঠে বারংবার অনুরণিত হয়-

لبيك اللهم لبيك ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ،

আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, আপনার কোনো অংশীদার নেই। আমি উপস্থিত, নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নি'মাত এবং রাজত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।

মূলত আল্লাহর নিকট উপস্থিতির এই অন্তর নিংড়ানো ঘোষণা একজন হাজ্জ পালনকারীর মহান রাব্বের নিকট পৌঁছানোর অনুভূতিকে শাণিত করে। সে তখন মনে প্রাণে উপলব্ধি করতে পারে, সে যেন লা-শারীক মহামহিয়ান এক অসীম সাম্রাজ্যের মালিক ও তার স্রষ্টার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার রাব্বের নৈকট্যের অনাবিল ঝর্ণাধারায় সে অবগাহন করে ধন্য হচ্ছে। একজন বান্দাহর এর চেয়ে আর বড় কল্যাণ প্রাপ্তির কোনো কিছু থাকতে পারে কি?হজ্জের বিধিবিধান সুন্দর ভাবে পালনের মাধ্যমে একজন বান্দা অন্তর আখিরাতের সাথে বেধে যায়।সে নিজেকে পবিত্র করতে পারে।তার আত্মা কে পবিত্র করতে পারে।

আত্মার পবিত্রতা অর্জনের প্রতিবন্ধকতার ও বাঁচার উপায়:

আত্নার পবিত্রতা অর্জনের কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলোঃ

অলসতা:

আত্মার পবিত্রতা অর্জনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হলো অলসতা। অলসতার মোকাবেলা করলে আমরা আমোদের নফসকে পবিত্র করতে পারবো। অলসতার মোতাবেলা করাই অলসতার চিকিৎসা। যদি অলসতার সামনে হিম্মত ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এর চিকিৎসা মোটেও হবেনা। বরং তার সামনে বুক টান করে দাঁড়াতে হবে। হিম্মতের সাথে সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। শক্তহাতে তার কোমর ভেঙে দিতে হবে। তাহলে দেখবে অনেক কাজ হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট কাজ চেষ্টার মাধ্যমে হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা ইয়া করে আমাদেরকে অলসতার মোকাবেলা করার হিম্মত দান করুন, আমিন।

কুদৃষ্টি:

কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় একটাই। তাহলো সংকল্প নেয়া সাহসের সাথে এ সংকল্প নেয়া যে, দৃষ্টির অপব্যবহার করবো না, মনের সেটা পরওয়া না করে তো পারিনা। যেহেতু তিনি আমার এ অন্যায়ের শাস্তি দিবেন। এভাবে চিন্তা করলে এর বরকতে ইনশাআল্লাহ্ গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে।

হারাম ভক্ষণ :

আল্লাহ তায়ালা বলেন,"তোমাদের জন্য হারাম করে দেখা হয়েছে-মৃত পশু, শুকুরের মাংস এবং সেইসব পশু যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ করা হয়েছে, যা গলায় ফাঁস লেগে, আঘাত পেয়ে বা উপর থেকে পড়ে গিয়ে বা অন্য পশুর শিঙের

আঘাতে অথবা যা কোনো হিংস্র পশু ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে -তা জীবিত পেয়ে যবাহ করলে ভিন্ন কথা-যা কোনো আস্তানার বলি দেয়া হয়েছে,

আবার হাদিসে এসেছে, "নেশা সৃষ্টি করে এমন কোনো যে কোনো পানীয় হারাম।"
(সহিহ আল বুখারি-৫০৪১)

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "মানুষের নিকট এমন সময় আসবে যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল হারাম বিবেচনা করবেনা।"
(সহিহ বুখারি-২০৫৯)

হারাম উপার্জনের ফলে তাকওয়াশূন্য হৃদয় তৈরি হয়। সেই হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যায়। এছাড়াও ত্বরিত গতিতে উর্পাজনের লালসা তৈরি হয়। দ্রুততার সাথে মানুষ অধিক উপার্জন আর ধনী হতে চায়। স্বল্পসময়ে ধনী হওয়া তার লক্ষ্য হয়ে থাকে। আর এর ফলে নফস অপবিত্র হয়ে যায়।

দুনিয়ার প্রতি আকষর্ণ:

আত্মার পবিত্রতা ও চরিত্র গঠন প্রত্যেক মুসলমানের জীবনে প্রয়োজন। এছাড়া কখনো তার দীন পরিশুদ্ধ হবে না। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার পরিশুদ্ধতা দীন শুদ্ধির ওপর নির্ভরশীল। দীন ছাড়াও দুনিয়াতে শান্তি অর্জন সম্ভব এমন ভাবনা শয়তানের ধোঁকামাত্র। পার্থিব প্রাচুর্যতা আর অন্তরের শান্তি এ দু'টি এক বিষয় নয়। অন্তরের শান্তি, আনন্দ ও স্থিরতা অর্থ-প্রতিপত্তির মাধ্যমে পাওয়া যায় না; বরং তার জন্য প্রয়োজন দীন। দীন ছেড়ে দিয়ে সম্পদের কুমির হওয়া যাবে, টাকার পাহাড় গড়া যাবে; বাড়ি গাড়ি এবং কারখানার মালিক হওয়া যাবে। কিন্তু দিলের শান্তি নামক সেই সোনার হরিণের মালিক হওয়া যাবে না। বস্তুত দিলের শান্তি, অন্তরের সুখ দীনের মাঝেই লুকায়িত। এ জন্যই দেখা যায়, যারা আল্লাহ তাআলার হুকুমের সামনে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, সেসব আল্লাহ ওয়ালাই প্রকৃত সুখের ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। আর এ দীন ও দুনিয়া সঠিক করতে হলে প্রয়োজন চরিত্র সংশোধনের। চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ছাড়া দীন ও দুনিয়া দুরন্ত হবে না। চরিত্রের দুটি রূপ তথা আল্লাহ তায়ালার ভয় ও আশা। যার অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা আসন করে নেয়, তার অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত আসন গ্রহণ করতে পারে না। আর হৃদয় আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা থেকে মুক্ত হলে সে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হবেই। এই কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

'দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল। (কানযুল উম্মাল ৬১১৪)

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াতে সংঘটিত সকল গুনাহের প্রতি একটু গভীর দৃষ্টি দিলে প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, সকল গুনাহের অন্তরালে দুনিয়ার মহব্বত কার্যকর। চোর চুরি করে কেন? দুনিয়ার মোহেই তো। বদমাশ বদমাশি করে? পার্থিব জগতের নেশা তার মধ্যে ক্রিয়াশীল, এজন্যই। মদ্যপের মদের নেশা মূলত দুনিয়ার সুখপ্রাপ্তির নেশা। অনুরূপভাবে প্রতিটি গুনাহের পেছনে এই একটি নেশাই ক্রিয়াশীল।দুনিয়ার ভালোবাসা যার অন্তরে আসন গেড়ে বসেছে তার অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা প্রবেশ করতে পারেনা।মানুষ দুনিয়া ছাড়া চলতে পারে না। তাকে এখানেই বসবাস করতে

হয়। ক্ষুধার প্রয়োজনে খেতে হয়। পিপাসার তাগিদে পান করতে হয়। মাথা গোঁজানোর ব্যবস্থা করতে হয়। জীবনের প্রয়োজনে জীবিকা উপার্জন করতে হয়। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এ সকল কাজ মানুষের নিতান্ত প্রয়োজন। দুনিয়াতে অবস্থান করতে হলে এসব প্রয়োজন মিটাতে হবেই।দুনিয়া বিমুখিতা গ্রহণ করতে হবে, এটা কেমন কথা। এটা বিশাল কঠিন কাজ নয় কি? হ্যাঁ, এই কঠিন কাজটি কীভাবে করতে হবে, প্রায়ই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উত্তরসূরী উলামায়ে কেরাম। তাঁরা বাতলে দেন তোমরা দুনিয়াতে বাস করা সত্ত্বেও তাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবে না কীভাবে। প্রকৃত মুসলমান তো সেই যে দুনিয়াতে বসবাসও করবে, দুনিয়াবাসীর সঙ্গে মিলেমিশে চলবে, তাদের হক আদায় করবে। পাশাপাশি দুনিয়ার মহব্বত থেকে নিজেকে নিরাপদেও রাখবে। হযরত আজিজুল হাসান মাজযুব রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"দুনিয়ার অধিবাসী, তবে দুনিয়া প্রত্যাশী নই। বাজারে আসা-যাওয়া থাকলেও ক্রেতা নই।"

দুনিয়াতে থাকবে, অথচ তার মহব্বত অন্তরে বসানো যাবে না, এরূপ অবস্থা সৃষ্টি হয় কীভাবে এ কথাটিই মাওলানা রুমি রহিমাহুল্লাহ একটি উপমার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন। চমৎকার উপমা। তিনি বলেছেন, মানুষ এই দুনিয়ার বাসিন্দা। তাই দুনিয়াতে টিকে থাকতে হলে অসংখ্য প্রয়োজনের মুখোমুখি হবে সে। মানুষের দৃষ্টান্ত কিশতির মতো আর দুনিয়া হলো পানির মতো। কেউ যদি পানি ছাড়া কিশতি চালাতে চায়, তাহলে কিশতি চলবে না। কারণ, পানি ছাড়া শুকনো স্থানে নৌকা চলতে পারে না। অনুরূপভাবে, পার্থিব ধন-সম্পদ ছাড়া, জীবিকা অর্জন ও পানাহার ছাড়া, ঘর-বাড়ি ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া মানুষের জীবন টিকে থাকতে পারে না। আর এ সকল জিনিসকেই তো দুনিয়া বলে। কিন্তু এই পানি ততক্ষণ পর্যন্ত কিশতির অনুকূলে শক্তি হিসেবে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা কিশতির নিচে, সামনে পেছনে এবং আশেপাশে অবস্থান করবে। এই পানি যদি কিশতির বাইরে অবস্থান করার পরিবর্তে কিশতির ভিতরে ঢুকে পড়ে তাহলে এই পানিই হবে তার জন্য কাল। এই পানিই ডুবিয়ে ধ্বংস করে ছাড়বে কিশতিকে। তেমনিভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থিব ধন-সম্পদ মানুষের আশেপাশে থাকবে, মানুষের প্রয়োজনে কাজে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ভয় নেই। কিন্তু যদি এই পার্থিব সম্পদ হৃদয়ের কিশতি ভেদ করে অন্দরে ঢুকে পড়ে,

তাহলে এই পানি তোমার 'জীবনতরীকে মাঝসাগের ডুবিয়ে মারবে। মাওলানা রুমী রহিমাহুল্লাহ এর ভাষায়-

পানি যতক্ষণ পর্যন্ত কিশতির আশেপাশে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিশতিকে চালাতে থাকে। কিন্তু পানি যখন কিশতির ভিতরে ঢুকে পরে তখন তাকে ডুবিয়ে দেয়।প্রকৃতপক্ষে দীনের শিক্ষা ও এটি। তার ভালোবাসা যেন অস্থিমজ্জায় বসে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই বুজুর্গগণ বলেছেন অসারতা বারবার স্মরণ করবে। উক্ত আয়াতটিতেও আল্লাহ তা'আলা একথা বলেছেন -

"হে মানুষ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সত্য সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে প্রতারণা না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই তোমাদেরকে আল্লাহর সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে "। (সুরা ফাতির আয়াত ৫০)

জনৈক লোক দুনিয়ার একটি চমৎকার উপমা দিয়েছেন। বলেছেন, দুনিয়া উপমা মানুষের ছায়ার মত। মানুষ যদি ছায়ার পেছনে দৌড়ে তাকে ধরতে চায়, তাহলে তা কখনো পারবে না। ছায়ার পেছনে যত দৌড়াবে, ছায়া তার চেয়েও অধিক গতিতে ভাগতে থাকবে। কিন্তু ছায়া থেকে মুখ ফিরিয়ে যদি তার উল্টো দিকে মানুষ চলতে শুরু করে, তাহলে ছায়াও সমগতিরে তার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকবে। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহও দুনিয়াকে এ রকম করে সৃষ্টি করেছেন। যদি মানুষ দুনিয়ার প্রার্থী হয়ে তাকে পাওয়ার লোভে তার পেছনে ছুটতে থাকে, তবে এ দুনিয়া কখনো ধরা দিবে না। দুনিয়া তখন আগে আগে ভাগতে থাকবে। তাকে ধরার সাধ্য থাকবে না। কিন্তু মানুষ যখন এ দুনিয়ার লোভ না করে তার প্রতি অনীহা দেখাবে, তখন দেখতে পাবে, দুনিয়া তার পদতলে কীভাবে থুবড়ে পড়ে। দুনিয়া কাছে আসার পর লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে তবুও পুনরায় সে পায়ের ওপর এসেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত মোটেও বিরল নয়। তাই অন্তরাত্মাকে পবিত্র করে একবার মাত্র দুনিয়া বর্জন করে দেখা জরুরি। দুনিয়ার অসাড়তা বুঝলেই তবে কথাগুলো বুঝে আসবে। নবি করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব হাদিসে দুনিয়ার অসাড়তা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন, এসব হাদিস পড়ে দুনিয়ার মহব্বত হৃদয় থেকে দূর করে দেওয়ার ফিকির করতে হবে।এর ফলে আমাদের আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হবে।

যুহদ ও আত্মার পবিত্রতা:

দুনিয়াবিমুখতার পরিচয়

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা কখনো শেষ হবে না।"(সূরা নাহল, ১৬:৯৬)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

"ভালোভাবে জেনে রাখো, দুনিয়ার এ জীবন একটা খেলা, হাসি- তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখিরাত এমন স্থান, যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।(সূরা হাদীদ, ৫৭:২০।)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أملا

"এ ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দুনিয়ার জীবনের একটি সাময়িক সৌন্দর্য মাত্র। আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার রবের কাছে ফলাফলের দিক দিয়ে উত্তম এবং এগুলোই আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল হবার উত্তম মাধ্যম। "(সূরা আল কাহফ, ১৮: ৪৬)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।" (সূরা আ'লা, ৮৭: ১৬-১৭)

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى

"আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগবিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেই সব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া জীবনোপকরণই উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী।"(সূরা ত্ব-হা, ২০: ১৩১)

দুনিয়াবিমুখতা, দুনিয়ার তুচ্ছতা, স্বল্পতা, ক্ষণস্থায়িত্ব, এর দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, আখিরাতের মর্যাদা, স্থায়িত্ব, এর দ্রুত আগমন ইত্যাদির আলোচনায় কুরআন পরিপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন, তখন তার অন্তরে একজন প্রহরী নিযুক্ত করে দেন, যার সাহায্যে সে দুনিয়া-আখিরাতের প্রকৃত অবস্থা দেখতে পায় এবং এ দুটির মধ্যে যেটি প্রাধান্য পাওয়া দরকার, সেটিকে প্রাধান্য দেয়।

অধিকাংশ মানুষ যুহদের ব্যাপারে নিজের পছন্দ-অপছন্দ, অবস্থা ও অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলেছেন। তবে এর চেয়ে ইলমি আলোচনা করাই উত্তম ও ফলপ্রসূ হবে। কারণ তা হবে দলীল-প্রমাণের নিকটবর্তী।

আমি শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যা এ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা হলো আখিরাতে যা উপকারে আসবে না, তা পরিত্যাগ করা। আর আল্লাহর ভয় হলো আখিরাতে যার ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, তাতে জড়িয়ে না পড়া।(ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমুউল ফাতাওয়া, ১০/৬১৫)।

এই কথাটি দুনিয়াবিমুখতা ও ভয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেগুলো মধ্যে সর্বোত্তম ও ব্যাপক অর্থবোধক কথা।

সুফইয়ান আস সাওরি বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হচ্ছে আশাকে ছোটো রাখা। এটি মোটা খাবার খাওয়া আর মোটা জোব্বা পরিধান করার নাম নয়। (ইবনু আবিদ দুনইয়া, আয-যুহদ, ১০৯)।

জুনাইদ বাগদাদি বলেছেন, 'আমি সারি সাকাতি-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে দুনিয়াকে ছিনিয়ে নিয়েছেন, এর থেকে তাঁর অতি কাছের লোকদেরকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর মহাব্বতের অধিকারী ব্যক্তিদের অন্তর থেকে তা বের করে দিয়েছেন। কারণ তিনি তাদের জন্য এতে সন্তুষ্ট হননি।(বাইহাকি, আয-যুহদুল কাবীর, ৬১)।

কেউ কেউ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলার এই বাণীতে যুহদের প্রকৃত অর্থ নিহিত রয়েছে-

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

"যাতে তোমাদের যা হাতছাড়া হয়ে যায়, তার কারণে তোমরা দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, সে জন্য গর্বিতও না হও।।(সূরা হাদীদ, ৫৭:২৩)।

সুতরাং যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ হলো সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার কোনোকিছু পেয়ে আনন্দ-উল্লাসও করে না আবার কোনোকিছু না পেলে আফসোসও করে না।

ইয়াহইয়া ইবনু মুআয বলেছেন, 'যুহদ নিজ মালিকানাকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে আর মহাব্বত আপন রূহকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করে। (আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৪০)।

ইবনুল জালা বলেছেন, 'যুহদ হলো দুনিয়ার দিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকানো যে, তা ধ্বংস হয়ে যাবে, ফলে তোমার চোখে তা ছোটো ও হীন হয়ে ধরা দেবে। যার দরুন দুনিয়া থেকে দূরে থাকা তোমার জন্য সহজ হবে।(আবদুল কারীম কুশাইরি, আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা, ১/২৪০)।

ইমাম আহমাদ বলেছেন, 'দুনিয়াবিমুখতা হলো ছোটো আশা পোষণ করা।(ইবনু রজব হাম্বালি, আমিউল উলুম ওয়াল হিকাম, ২/১৮৪।)

তাঁর থেকে আরেকটি কথা বর্ণিত আছে, যুহদ হলো দুনিয়া কারও কাছে হাজির হলে আনন্দিত না হওয়া এবং হাতছাড়া হয়ে গেলে পেরেশানও না হওয়া। তাকে একজন লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যার সাথে এক হাজার দীনার ছিল, সে কি দুনিয়াবিমুখ হতে পারবে? তিনি জবাব দেন, 'হ্যাঁ, একটি শর্তে হতে পারবে। তা হলো এই সম্পদের চেয়ে যদি তার আরও সম্পদ বেড়ে যায়, তা হলে সে আনন্দিত হবে না আবার যদি এর থেকে কমে যায়, তা হলে সে দুঃখও পাবে না।(ইবনু আবী ইয়া'লা, তবাকাতুল হানাবিলা, ২/১৪)

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, 'যুহদ হলো অভাবের প্রতি ভালোবাসার সাথে আল্লাহর ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা।' এটি শাকীক বালখি ও ইউসুফ ইবনু আসবাত এ-এরও কথা।

দুনিয়াবিমুখতার প্রকৃত মর্ম এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াদি:

আল্লাহর মা'রিফাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ একমত পোষণ করেছেন যে, যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা হলো দুনিয়ার আবাস থেকে আখিরাতের আবাসের দিকে আত্মিক সফর। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণ অনেক কিতাব রচনা করেছেন; যেমন: আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ওয়াকী, হান্নাদ ইবনুস সারি-সহ আরও অনেকেই। (সকলেই নিজ নিজ রচনার নাম দিয়েছেন 'কিতাবুয যুহদ'।)

যুহদ সম্পর্কিত ছয়টি বিষয় রয়েছে, যেগুলো থেকে বিমুখতা প্রদর্শন না করা পর্যন্ত কেউ যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতার গুণে গুণান্বিত হতে পারবে না। সেগুলো হলো:

১. সম্পদ,

২. (সুন্দর) আকৃতি,

৩. কর্তৃত্ব,

৪. মানুষজন,

৫. নফস এবং

৬. আল্লাহ ছাড়া বাকি সবকিছু।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সবকিছু একেবারে ছেড়ে দেবে। কারণ সুলাইমান ও দাউদ ছিলেন তাদের সময়কার সবচেয়ে বড়ো দুনিয়াবিমুখ। অথচ তাদের প্রাচুর্য ছিল অনেক বেশি, স্ত্রী, দাস-দাসী এবং রাজত্বও ছিল ব্যাপক। আমাদের নবি ছিলেন সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ; অথচ তাঁরও ছিল নয়জন স্ত্রী। আলি ইবনু আবী তালিব, আবদুর রহমান ইবনু আউফ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম ও উসমান ইবনু আফফান ছিলেন দুনিয়াবিমুখদের অন্যতম; এর সাথে সাথে তাদের বেশ অর্থসম্পদও ছিল। হাসান ইবনু আলি খাঁটি যাহিদদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এর পাশাপাশি তিনি তার স্ত্রীদের প্রচণ্ড ভালোবাসতেন এবং আদর করতেন আর তিনি ধনাঢ্যদেরও অন্তর্ভুক্ত

ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এর অনেক ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী। এমনিভাবে লাইস ইবনু সা'দ ও সুফইয়ান সাওরি ছিলেন দুনিয়াবিমুখদের ইমাম। সুফইয়ান সাওরি-এর অনেক ধনসম্পদ ছিল, তিনি বলতেন, 'এগুলো যদি না থাকত, তা হলে তারা (রাজা-বাদশাহরা) আমাদেরকে রুমাল হিসেবে ব্যবহার করত। অর্থাৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত।"(আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৬/৩৮১)

যুহদ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো হাসান বাসুরি-এর কথা। তিনি বলেছেন, 'হালাল বস্তুকে নিজের ওপর হারাম করে নেওয়া এবং বেশি বেশি সম্পদ ব্যয় করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়; বরং তা হলো আপনার হাতে যা রয়েছে, তার তুলনায় আল্লাহর হাতে যা রয়েছে, তার ওপর বেশি নির্ভরশীল হওয়া, আপনার নিকট বিপদাপদ না আসার চেয়ে আপনি বিপদাপদের সম্মুখীন হয়ে যে সাওয়াবের অধিকারী হবেন, তার প্রতি বেশি আগ্রহী হওয়া।।(ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ২৭৭০)

এটি হলো দুনিয়াবিমুখতা সম্পর্কে সবচেয়ে ব্যাপক ও উত্তম কথা।

দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করার পদ্ধতি:

দুনিয়াবিমুখতার সূচনা করতে হবে হারাম ছাড়ার পর সন্দেহযুক্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করার মাধ্যমে; যা বান্দার মনে সংশয় সৃষ্টি করে যে, এটি হালাল নাকি হারাম?

যেমন নু'মান ইবনু বাশির থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবি
করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِتَّى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

"নিশ্চয় হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, আর এ দুয়ের মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয়, যেগুলো অনেক মানুষই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হওয়া

থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে অটুট রাখে, আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়, সে হারামে জড়িয়ে যায়। এর উদাহরণ হলো, যেমন কোনো রাখাল কারও সংরক্ষিত চারণভূমির আশপাশে পশু চরায়, আশঙ্কা রয়েছে যে, সে তার ভেতরে ঢুকে পড়বে। মনে রেখো, প্রত্যেক রাজা সংরক্ষিত এলাকা থাকে। আর মনে রেখো, আল্লাহর সংরক্ষিত হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো। মনে রেখো, দেহের মধ্যে এক টুকরো গোশত রয়েছে; যা সংশোধিত হলে পুরো দেহই সংশোধিত হয়ে যায়, আর যা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো দেহই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রেখো, সেটা হলো কলব বা অন্তর।"

আসলে সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি হলো হালাল ও হারামের মাঝে ভিন্ন একটি জগৎ।

এরপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার, পানীয়, পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি, বিবাহ- শাদী ইত্যাদি বিষয় থেকে বিমুখ হওয়া, আস্তে আস্তে এগুলোও পরিত্যাগ করা; এর মাধ্যমে যুহদ বা দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করা যায়।

যুহদের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা অর্জনের উপায়:

সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন (যুহদ)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য হলো- সরল, সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন। ইসলামের দৃষ্টিতে এ পার্থিব জীবন হলো আল্লাহ প্রদত্ত একটি বড় নি'মাত এবং একে ন্যায়ানুগভাবে ভোগ করতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয়ও। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنْ أَنْعَمَ اللَّ
هُ عَزَّ وَجَلَّ، عَلَيْهِ نِعْمَةً، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

"আল্লাহ তায়ালা যাকে কোন নেয়ামত দান করেন নিশ্চয়ই তিনি পছন্দ করেন যে তাঁর দেওয়া সেই নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দার মধ্যে পরিলক্ষিত হয় "(আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. নং: ১৯৯৩৪)

তবে এ জীবন ভোগ করার ক্ষেত্রে সরলতা ও অনাড়ম্বরতাই ইসলামে একান্ত কাম্য। কৃত্রিম আচরণ ও জীবন যাপন এবং বড় মানুষী ও অহঙ্কার প্রদর্শন ইসলাম মোটেও সমর্থন করে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" - الْبَذَاذَةَ مِنَ الإِيمَانِ

সরলতা ও সাদাসিধে জীবন যাপন হলো ঈমানের অন্ত র্ভুক্ত। "(আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাব: আত-তাজুল), হা. নং: ৪১৬৩; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান,)

সাইয়িদুনা 'উমার (রা.) বলেন,

- لهينا عن التكلف

"আমাদেরকে কৃত্রিম আচরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। "

উল্লেখ্য যে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়, তার নিকট পার্থিব জগত একটি মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হয় এবং এ দুনিয়া ও তার সুখ-সম্ভোগের প্রতি তার আগ্রহ লোপ পায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর খালীফা ও সাহাবীগণ (রা.) অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। এ দুনিয়ার বিত্ত-বৈভব, ভোগ-বিলাস, মান-মর্যাদা ও আসবাবপত্রের প্রতি তাঁদের না ছিল কোনো লোভ, না ছিল কোনো আগ্রহ। অনাড়ম্বর পোশাক- পরিচ্ছদ, সাধারণ খাদ্য, জাঁকজমকহীন মামুলি বাড়ি-ঘর, সাদাসিধে ও গরীবানা জীবন যাপন ছিল তাঁদের জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এ দুনিয়াটা তো একজন মুসাফিরের ক্ষণকালের বিশ্রামস্থল মাত্র। কাজেই একজন মুসাফির সফরের জন্য যে সাদামাটা ও একান্ত প্রয়োজনীয় রসদপত্র সংগ্রহ করে, ঠিক সে ধরনের রসদপত্রই দুনিয়ায় বসবাসের জন্য যথেষ্ট।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন," -

الدنيا كأنك غَرِيبٌ أَوْ عابر سبيل.

নিরাসক্তভাবে, যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা পথিক। "

বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাব: আর-রিকাক), হা, নং: ৬০৫৩; তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: আয-যুহদ), হা, নং: ২৩৩৩)

দুজাহানের সর্দার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট এ বলে দু'আ

" -اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْم الْقِيَامَةِ

হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীনরূপে জীবিত রাখুন! মিসকীনরূপে মৃত্যু দান করুন এবং কিয়ামাতের দিনে মিসকীনদের দলেই আমার হাশর করুন!"(তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং। ২৩৫২; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান,(কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪১২৬)

তাঁর বিছানা ছিল খেজুর পাতার চাটাই। একদিন ঘুম থেকে জাগলেন। কাছেই ছিলেন প্রিয় সাহাবী 'উমার (রা.)। চেয়ে দেখলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসারা পিঠে খেজুর পাতার দাগ পড়ে আছে। রোম পারস্যের বেদীন বাদশাহরা কতো আড়ম্বরের জীবন কাটায় আর আখিরী নবী সাইয়িদুল মুরসালীন এতো কষ্টে জীবন যাপন করবেন- এসব ভেবেই হয়তো প্রিয়নবীর জন্য একটু কোমল বিছানা

তৈরির অনুমতি চাইলেন 'উমার (রা.)। কিন্তু সাইয়িদুল মুরসালীন এই বলে বারণ করলেন যে,

ما لِي وَلِلدُّنْيَا مَا مَثْلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِب سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

দুনিয়ার প্রতি আমার আকর্ষণ নেই। দুনিয়ায় আমার একমাত্র উদাহরণ হলো ঐ উষ্ট্রারোহী, যে গ্রীষ্মের দিনে একটি গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়, অতঃপর তা ছেড়ে চলে যায়। (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হা. নং: ২৭৪৪)

আরেক দিনের ঘটনা। দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিয়ে আদুরের দুলালী ফাতিমা (রা.)- এর গৃহপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হঠাৎ দেখতে পেলেন ফাতিমা (রা.)-এর গৃহদ্বারে একটি রঙিন পর্দা ঝুলছে।

নন্দিনী ফাতিমা (রা.)-এর ঘরে ইতঃপূর্বে কখনো আড়ম্বরের কিছু দেখা যায়নি। মূলত আজ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন উপলক্ষেই এমনটি করা হয়েছিল। এ মুহূর্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো ভাবলেন, এই আরবে এখনো কতো দুঃখী-দরিদ্র মানুষের রোনাজারি। কতো বুভুক্ষের ক্রন্দন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চিন্তায় অধীর সারাক্ষণ, আর তাঁর দুলালীর দ্বারে রঙিন পর্দা ঝুলবে। চোখেমুখে ক্রোধের ছাপ নিয়ে এবার সেখান থেকেই ফিরে এলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওদিকে খাতুনে জান্নাত সাইয়িদা ফাতিমা (রা.)-এর মনে সীমাহীন উৎকণ্ঠা। অতঃপর আলী (রা.) খবর নিয়ে এসে জানালো, নবী-নন্দিনীর এ সামান্য বিলাসিতাটুকুও নবীজীর পছন্দ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি ক্ষমা চেয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন যে, আব্বাজানকে বলো, তিনি যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দুঃখী- দরিদ্রদেরকে দান করে দেন। (বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাব: আল-হিবাহ), হা. নং: ২৪৭১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যেও কেউ কেউ অত্যন্ত ক্ষমতাধর ও ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া সত্ত্বেও চলাফেরা করতেন একজন মামুলি লোকের মতো। আবূ বাকর (রা.) ছিলেন এরূপ একজন মহান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিন্তু তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরহীন, অত্যন্ত সহজ- সরল। তিনি প্রায় এ বলে দু'আ করতেন,

" - اللَّهُمَّ ابْسُطْ لِي الدُّنْيَا وَزَدْنِي فَيْهَا.

হে আল্লাহ, দুনিয়া আমার জন্য প্রশস্ত করে দাও। কিন্তু এর ঘূর্ণাবর্তে নিমগ্ন ও আসক্ত হওয়া থেকে আমাকে রক্ষা করো।

(দাতা গঞ্জে বখশ, কাশফুল মাহজুব, পৃ. ৭০: হাক্কী, রূহুল বায়ান, খ. ৫, পৃ. ৩৩০ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও প্রায় অনুরূপ দু'আ বর্ণিত রয়েছে। (দ্র. তাবারানী, আদ-দু'আ, হা. নং: ১৪৪৯)

তাঁর খিলাফাত কালেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ মুসলিমরা জয় লাভ করে। এতদসত্ত্বেও তাঁর অনাড়ম্বর জীবন যাপনের প্রতি আগ্রহের অবস্থা এই ছিলো যে, তিনি নিজে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা পছন্দ করতেন। খালীফা হওয়ার পরও তিনি কিছু দিন সংসারের খরচের জন্য বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। রাজকোষ থেকে সামান্য ভাতা নিতেন। মুসলিম বিশ্বের খালীফা হয়েও তিনি জাতীয় সম্পদ ভোগ করার ব্যাপারে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, তা সর্বকালের মানুষের আদর্শ হয়ে থাকবে। একবার তাঁর স্ত্রীর হালুয়া খাওয়ার সাধ জাগলো। তিনি তাঁর ইচ্ছার কথা স্বামীকে জানালে তিনি উত্তরে বলেন, "তা কেনার মতো সামর্থ্য আমার নেই।" স্ত্রী বললেন, "আচ্ছা! আপনি প্রতি দিনের খরচের জন্য আমাকে যা কিছু দিয়ে থাকেন, তা থেকে আমি কিছু কিছু সঞ্চয় করে হালুয়ার মূল্য সংগ্রহ করবো।" আবূ বাকর (রা.) বললেন, আচ্ছা, তা করো। কয়েকদিনের মধ্যে হালুয়ার অর্থ সংগৃহীত হয়ে গেলো। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আবূ বাকর (রা.) বললেন, "এটা তো আমাদের খাদ্যের উদ্বৃত্ত অংশ।" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে, কিছু অর্থ হ্রাস করলেও আমাদের প্রতিদিনের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে। তাই প্রতিদিন যে পরিমাণ অর্থ তাঁর স্ত্রী জমা করেছিল, সে পরিমাণ অর্থ তিনি ভাতা থেকে হ্রাস করে দেন। আর ইতোমধ্যে তাঁর স্ত্রী হালুয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, তাও তিনি রাজকোষে ফিরিয়ে দেন।"(ইবনুল আসীর, আল-কামিল, খ. ১,পৃ. ৩৯৭)

আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) লোকদেরকে এক সাথে নানা সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করা থেকে বারণ করতেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, এভাবে লোকেরা নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে লেগে যাবে, ভালো ভালো খাবার গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং এর জন্য বাড়াবাড়ি ও কৃত্রিম আচরণ শুরু করে দেবে।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার সাইয়িদুনা 'উমার (রা.)-এর নিকট খবর পৌঁছে যে, ইয়াযীদ ইবুন আবী সুফিয়ান (রা.) নানা আইটেমের খাবার খান। এ খবর জানার পর 'উমার (রা.) তাঁর গোলাম ইয়ারফা' (রা.) কে বললেন, যখন তুমি জানতে পারবে যে, রাতে তাঁর খাবার পৌঁছে গেছে, তখন তুমি আমাকে অবহিত করবে। অতএব, যখন রাতে ইয়াযীদ (রা.)-এর নিকট তাঁর খাবার পৌঁছলো, তখন ইয়ারফা' 'উমার (রা.) কে অবহিত করলো। এরপর 'উমার (রা.) তাঁর বাড়িতে এসে প্রথমে সালাম করলেন, তারপর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন। এ অবস্থায় প্রথম খাবার আসলো রুটি-গোস্ত। 'উমার (রা.) তাঁর সাথে বসে খেলেন। এরপর ভুনা গোশত আনা হলো। ইয়াযীদ (রা.) খাবার জন্য হাত বাড়ালেন। এমতাবস্থায় 'উমার (রা.) তাঁকে বারণ করলেন এবং বললেন,

والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام والذي نفس عمر بيده لأن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقتهم.

ইয়াযীদ এক খাবারের সাথে দ্বিতীয় খাবার! আল্লাহর কসম, যদি তোমরা লোকদের সাধারণ রীতির অনুসরণ না করো, তবে লোকেরাও তোমাদের রীতি অনুসরণ করে একপর্যায়ে নিজেদের রীতি ছেড়ে দেবে।" (ইবনুল মুবারাক, আয-যুহদ, হা.নং:৫৭৮; 'আলী আল-হিন্দী, কানযুল 'উম্মাল, হা.নং: ৩৫৯২১)

এ হলো প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার ও খালীফাগণের সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের কয়েকটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। আজকের পৃথিবীতে আমাদের নিকট এসব কথা গল্পের মতোই মনে হবে। কারণ এ যুগের ক্ষমতাশীল ও তাদের পরিবারবর্গের পক্ষে এসব বিষয়ের কল্পনাও যেন কষ্টকর।

রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবীরা এভাবেই যুহদের মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করেছিলেন।আমাদের ও উচিত এই যুহদকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করা। তবেই আমাদের আত্মা পবিত্র হবে ইন শা আল্লাহ।

মুজাহাদাহ র মাধ্যমে আত্মার পবিত্রতা:

যদি কখনো কোনো গুনাহ বা অন্যায় কাজ সংঘটিত হয় অথবা কোনো ভালো কাজ ছুটে যায় এবং তাওবাহ ও ভৎর্সনা দ্বারা কাজ না হয়; বরং তা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হতে থাকে, তা হলে নাফসের জন্য কিছু শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যেমন- প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও সুস্থতার প্রতি খেয়াল রেখে অতিরিক্ত বিশ্রাম ও পানাহার ত্যাগ করা, অতিরিক্ত সাজসজ্জা ত্যাগ করা, মানুষের সাথে একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত মেলামেশা পরিহার করা, নিজের ওপর অতিরিক্ত শারীরিক বা আর্থিক কোনো দায়িত্ব (যেমন- নাফল নামায, নাফল রোযা, নাফল সাদাকাহ) আরোপ করা বা নিজের ওপর শারীরিক কোনো হালকা দণ্ড চাপানো, শারীরিকভাবে গরীব-মিসকীনদের খিদমাত ও সেবা করা এবং নিজের অতীতের অসহায়ত্ব ও দুর্দশার কথা বর্ণনা করা প্রভৃতি। নাফসের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য চিকিৎসাস্বরূপ এ প্রকৃতির যে সব 'আমাল করা হয়, সূফীদের পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজাহাদাহ' বলা হয়। কেননা, এতেও নাফস দলিত হয় এবং প্রকৃত মুজাহাদাহর প্রশিক্ষণ ও তাকে অভ্যাসে পরিণত করার ক্ষেত্রে এ কাজের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সালাফে সালিহীনের 'আমালের মধ্যেও এভাবে নিজেকে শাস্তি দেওয়ার ও দলিত করার নজীর খোঁজে পাওয়া যায়। নিম্নে এরূপ কাজের কয়েকটি রিওয়াত উল্লেখ করা হলো-

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের যে বিছানায় আরাম করতেন, সেটি ছিলো চটের। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরসেটিকে দ্বিগুণ করে দিতাম। তিনি তার ওপর বিশ্রাম করতেন। এক রাতে আমি সেটিকে আরো দ্বিগুণ করে মোট চারপাট করে বিছিয়ে দিলাম, যাতে তিনি আরো বেশি প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। সকাল বেলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, مَا فَرَشْتُمْ لِي اللَّيْلَةَ؟ -"আজ রাতে তুমি আমার জন্য কী বিছিয়েছিলে?"

আমি আরয করলাম, هُوَ فِرَاشُكَ إِلَّا أَنَّا .ثنيناه بأربع ثنياتٍ ، قُلْنَا :هُوَ أَوْطَأَ لَكَ "সে পুরাতন বিছানাটিই। আমি শুধু তাকে চার ভাঁজ করে দিয়েছিলাম। মনে করলাম, এটা আপনার জন্য অধিক আরামপ্রদ হবে।" তিনি বলেন, رُدُّوهُ لِحَالَتِهِ الْأُولَى ، فَإِنَّهُ مَنَعَتْنِي وَطَاءَتْهُ صَلَاتِي : না "ওটিকে পূর্বেকার মতো করে দাও। কেননা, সে বিছানার কোমলতা আজ রাতে আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।

(তিরমিযী, আশ-শামা'য়িল, হা. নং:৩২৯; বাগাভী, আল-আনওয়ারু ফী শামা 'য়িলিন নাবী, হা. নং। ৮৩৫ ৬১৯. মালিক, আল-মুওয়াত্তা, হা. নং: ৩৬২১; বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, (৩৪: হিফযুল লিসান), হা. নং:৪৫৯৬, ৪৬৩৬)

আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 'উমার আল-ফারুক (রা.) খালীফা আবূ বকর আস-সিদ্দীক (রা.)-এর খিদমাতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তিনি স্বীয় জিহ্বা ধরে টানছেন। তা দেখে 'উমার (রা.) আরয করলেন, مهُ، يَغْفِرُ الله لك "আপনি এ কি করছেন? ছেড়ে দিন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!" উত্তরে খালীফা আবূ বকর (রা.) বললেন, إِنْ هَذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ. "এ জিহ্বা আমাকে অনেক বিপদে ফেলেছে।"

(দীনাউরী, আল-মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল 'ইলম, হা. নং: ১৬৮২; 'আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, হা. নং: ৩৫৯৯২)

'উমার আল-মাখযূমী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমীরুল মু'মিনীন 'উমার (রা.) তাঁর এক বক্তব্যে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করে সমবেত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

أَيُّهَا النَّاسُ :لَقَدْ رَأَيْتَنِي أَرْعَى عَلَى خَالاتٍ لِي مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ ، فَيَقْبِضْنَ لِي

الْقَبْضَةَ مِنَ التَّمْرِ أو الزبيب ، فَأَظَلَّ يَوْمِي وَأَيُّ يَوْمٍ .

হে জনমণ্ডলী, আমি সে যুগও দেখেছি যে, যখন আমি বনি মাখযূমে আমার খালাদের বকরী চরাতাম। তারা এর বিনিময়ে আমাকে এক মুষ্টি খেজুর আর কিসমিস দিতো। আমি তা দিয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিতাম। সে এক করুণ সময় ছিলো।

বক্তব্য শেষে 'আবদুর রাহমান ইবনু 'আউফ (রা.) তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ !ما زدت على أن قدمت نَفْسَكَ - يعني :عبت -
হে আমীরুল মু'মিনীন, আজ তো আপনি নিজের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বললেন না। তিনি উত্তর দিলেন,

وَيْحُكَ يَا ابْنَ عَوْفٍ !إِنِّي خَلَوْتُ ؛ فَحَدَّثَتْنِي نفسي ؛ قال :أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ؛ فَمَنْ ذَا أَفْضَلُ مِنْكَ ؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعَرِّفَهَا نَفْسَهَا.

হে ইবনু 'আউফ, ধিক তোমাকে! আমি একাকী ছিলাম। এ সময় আমার মন আমাকে বলে, তুমি তো আজ আমীরুল মু'মিনীন! মুসলিমদের মধ্যে তোমার চাইতে শ্রেষ্ঠ কে হবে? তাই আমি ইচ্ছা করেছি, স্বীয় নাফসকে দলিত করবো এবং তাকে আমার পূর্বের অবস্থা জানাবো।

উপর্যুক্ত রিওয়ায়াতসমূহ থেকে নাফসের নিয়ন্ত্রণ ও শারী'আতের বিধি-নিষেধ পালনে নিজেকে অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যে নাফসের জন্য কিছু শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যায়। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, যাতে এ কাজে কোনোরূপ সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি করা না হয়। যেমন- হালালকে হারামে পরিণত করা, বিয়ে-শাদী ত্যাগ করা, প্রয়োজনীয় পানাহার, বিশ্রাম ও সাজসজ্জা পরিহার করা, পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরাফেরা করা, নিভৃতে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে লোকালয় ছেড়ে চলে যাওয়া এবং অরুচিকর ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করা প্রভৃতি। সনাতন হিন্দু ও খ্রিস্ট প্রভৃতি ধর্মে সাধনার নামে এ সব কাজ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইসলামী শারী'আতে এ সব কাজ সমর্থনযোগ্য নয়।

নফসের সংঘাত:

মুজাহাদার আভিধানিক অর্থ সাধনা করা, চেষ্টা করা, পরিশ্রম করা। 'জিহাদ' শব্দেরও শব্দমূল অভিন্ন। এই জন্যই জিহাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ লড়াই করা নয়; বরং চেষ্টা, সাধনা বা মেহনত করা। সুতরাং জিহাদ ও মুজাহাদা শব্দদ্বয়ের অর্থ অভিন্ন। তবে কুরআন হাদীস ও সুফীদের পরিভাষায় মুজাহাদা বলা হয়, এমন বিষয়ে চেষ্টা-সাধনা করাকে যার দ্বারা সাধকের আমল-আখলাক তথা কর্ম ও চরিত্র পরিশীলিত হয়, মার্জিত হয়, সে নিজেকে গুনাহ থেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং নিজের নফসকে দমন করতে সক্ষম হয়। এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হতে হলে যে শ্রম ও সাধনার প্রয়োজন, তাই মুজাহাদা। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ

প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে নিজের মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।(সহিহ আহমাদ ৬/২১)

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করাও জিহাদ। কিন্তু প্রকৃত মুজাহিদ সে যে তার নফস ও কুপ্রবৃত্তি এবং মনের অসাধু চাহিদা ও বাসনার হাতছানিকে পদদলিত করে সৎ ও ভালো পথ বেছে নিতে সক্ষম নয়। এরই নাম মুজাহাদা। সুতরাং যে ব্যক্তি নফসের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহর নৈকটা কামনা করে, তাকে অবশ্যই কঠোর মুজাহাদা করতে হবে এবং মনের অসৎ অভিলাষ ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ করে তার ওপর কঠোর শাসন চালিয়ে তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। এভাবে রিপুর সাথে লড়াই করে তার বিপরীত অভ্যাস গড়ে তোলাই মুজাহাদার প্রকৃত অর্থ।

মানুষের প্রবৃত্তি শক্তি তথা এমন শক্তি যা মানুষের মধ্যে কাজের স্পৃহা জোগায়, সেটি পার্থিব ইনজয় লাভে অভ্যস্ত। তাই মানুষ যে কাজে বাহ্যিক আনন্দ এবং তৃপ্তি অনুভব করে, সেদিকেই মন ধাবিত হতে থাকে। এ জাতীয় কাজে অনুপ্রাণিত করাই নফসের স্বভাব। নফস মানুষকে এমনভাবে উৎসাহিত করতে থাকে যে, কাজটি করো, আনন্দ পাবে, ইনজয় অনুভব হবে। এমতাবস্থায় মানুষ যদি নফসকে লাগামহীন ছেড়ে দেয় এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করে, তার কথা মতো কাজ করতে থাকে, তাহলে তখন মানুষ আর প্রকৃত মানুষ থাকে না। বরং সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্তরে পৌঁছে যায়।

নফসের চাহিদার মূল স্বভাব হলো, তুমি তার আনুগত্য করতে থাকো, তার পিছনে চলতে থাকো, তার কথা মতো জীবনাযপন করতে থাকো, কখনো শান্ত হবে না। নফস কখনও একথা বলবে না যে, তার কামনা, চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে, সে তৃপ্তি বা প্রশান্তি লাভ করেছে। এখন আর কোনো কিছুর চাওয়া পাওয়া নেই। এমনটি আজীবনেও হওয়ার নয়। কারণ মানুষের চাহিদার অন্ত নেই। তাই নফসের বশ্যতা স্বীকারের মাধ্যমে কখনো স্থিরতা বা প্রশান্তি লাভ করা যায় না। প্রকৃতির নিয়ম হলো- যদি কেউ চায় যে, নফসের সকল দাবি পূরণ করবে, তাহলে কখনো সে ব্যক্তি প্রশান্তি ও স্থিরতার ঠিকানা খুঁজে পাবে না। নফস ও প্রবৃত্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, একটির স্বাদ অনুভব করার সাথে সাথে আরেকটির স্বাদ আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়ে যাওয়া। সুতরাং যদি চাও নফসের চাহিদা পূরণ করে প্রশান্তিময় জীবন লাভ করবে তাহলে কখনো তা হওয়ার নয়।

বর্তমানে যাদেরকে উন্নত জাতি মনে করা হয় তাদের বক্তব্য হলো, মানুষের প্রাইভেট লাইফ বা ব্যক্তিগত জীবনে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করো না। যার যা ইচ্ছা, তাই করতে দাও, যেভাবে যে আনন্দ পায় তাকে সেভাবে আনন্দ করতে দাও।

তাতে কোনা বিধি-নিষেধ আরোপ করো না। একটু লক্ষ্য করুন, বর্তমানে ভোগ বিলাসের পথে কোনো বাধা নেই। প্রচলিত আইন কিংবা সামাজিক বাধা কোনোটাই নেই। সবাই নিজের ইচ্ছে মতো চলছে। তদুপরি যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভোগ উপভোগ পরিপূর্ণভাবে অর্জন হয়েছে তো? প্রতিউত্তরে কারো মুখ থেকে হ্যাঁ বের হবে না। প্রত্যেকের মনের আওয়াজ একটাই হবে, আরো চাই, আরো প্রয়োজন। যেহেতু চাওয়া পাওয়া তো অন্তহীন বিধায় এক চাহিদা আরো হাজারো চাহিদার জন্ম দেয়।

আল্লামা বুসিরী রহিমাহুল্লাহ নামক একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন। যিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসায় 'বাসীদায় বুরদাহ' নামক একটি সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থ নিখেছেন। তাতে তিনি নফস সম্পর্কে একটি জ্ঞানগর্ভ ও বিস্ময়কর কবিতা লিখেছেন। তিনি বলেন-

“নফস বা প্রবৃত্তি দিলে বড় হয়েও দুধ পানে অভ্যস্ত থেকে যাবে। আর যদি দুগ্ধপান বন্ধ করে দাঁও, তবে কিছুদিন কান্নাকাটি করে এমনিতেই সে তা ছেড়ে দিবে।”

মানুষের নফসও ঠিক যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। যে মায়ের দুধ পান করে এবং দুধ পানে অভ্যস্থ। যদি তাকে দুধ ছাড়ানোর লক্ষ্যে দুগ্ধপান বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে প্রথম দিকে সে কান্নাকাটি করবে। অবশেষে দুগ্ধপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি এই চিন্তা করে যে, দুধ ছাড়ালে আমার সন্তান কান্নাকাটি করবে, তার কষ্ট হবে। সুতরাং তাকে দুগ্ধপান বন্ধ করা যাবে না। তাহলে এই শিশু বড় হয়েও দুগ্ধপান করতে চাইবে। তার সামনে রুটি বা সাধারণ খাবার আনলে সে বলবে, আমি খাবো না, আমাকে দুধ দিতে হবে। কিন্তু কোনো সচেতন মা-বাবা তাদের শিশু সন্তানটিকে সাময়িক কান্নাকাটি ও কষ্টের ভয়ে আজীবন মায়ের দুগ্ধপানে অভ্যস্ত রাখে না। তারা জানে, শিশুর দুগ্ধপান বন্ধ করলে সে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুদিন কান্নাকাটি করবে, রাতে ঘুমোতে চাইবে না। মা-বাবাকে ঘুমোতে দিবে না। তবুও শিশুর বৃহত্তম স্বার্থ ও কল্যাণের কথা ভেবে তারা দুধ ছাড়িয়ে নেয়। যদি শিশুর দুধ ছাড়ানো না হয়, সারা জীবনেও সে স্বাভাবিক খাবারের উপযোগী হবে না।

আল্লামা বুসিরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মানুষের নফসও এই ছোট শিশুটির ন্যায়। তার অন্তরে গুনাহের মজা জেঁকে বসেছে। যদি তাকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, সে নানা রকম গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে। তাকে তখন ফেরানো বড়ই মুশকিল হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা, গীবত করা, সুদ ও ঘুষ খাওয়ায় অভ্যস্ত তার এসব বদ স্বভাব দূরীভূত করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এখন যদি নফসের এই কষ্ট দেখে পিছিয়ে পড়ে বা ঘাবড়ে যায়, তাহলে সারা জীবনেও সে গুনাহের কাজ ছাড়তে পারবে না এবং সে আন্তরিক স্থিরতা ও প্রশান্তিও লাভ করতে পারবে না।

প্রশান্তি রয়েছে আল্লাহর যিকিরে:

মনে রাখতে হবে, নাফরমানীর মাঝে প্রশান্তি নেই। এ পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণও যদি একসাথে করা হয়, তবুও প্রশান্তির ঠিকানা খুঁজে পাবে না, স্থিরতা

লাভ হবে না। অর্থ সম্পদের পাহাড় রয়েছে, শিক্ষার আলো রয়েছে, আমোদ প্রমোদ, চিত্তবিনোদন ও ভোগ বিলাসের সকল দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। তবুও তাদের মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা নেই কেন? কারণ তারা শান্তি খুঁজে গুনাহ ও পাপাচারের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থেকে। এভাবে প্রশান্তির গন্ধও পাবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

الَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ

আল্লাহর যিকিরের মাঝেই রয়েছে আত্মার প্রশান্তি ও স্থিরতা।(সুরা তুর রাদ :২৮)

নাফরমানি আর পাপাচারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকবে আর শান্তিও কামনা করবে এটা বোকামী ও মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। মনে রাখে হবে, কখনো এভাবে শান্তি মিলবে না বরং তুমি তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ তাআলা তাদেরকেই প্রশান্তি ও স্থিরতা দিয়ে থাকেন, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির ও ভালোবাসায় সজীব ও সদা জাগ্রত থাকে। যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে হয়তো বা তাদেরকে নিঃস্ব মনে হয়। অতএব দুনিয়াতে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করতে হলে অবশ্যই গুনাহ ত্যাগ করতে হবে। নফস তথা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর মুজাহাদা করতে হবে।

তদ্রূপ এই মুজাহাদা প্রথম প্রথম তো কষ্টকর মনে হবে। নফস চাচ্ছে গিবত করতে। গিবতের মজলিসে বসে চায়ের কাপে ঝড় তুলতে। এখন সবক দেওয়া হচ্ছে, তাতে লাগাম লাগানোর। তাই এটা এখন এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখবো, অভিজ্ঞতা না থাকার দরুণ এটাকে কষ্টসাধ্য মনে হয়। একটিবার মাত্র নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা করার দৃঢ় সংকল্প করুন, তাহলে দেখতে পাবেন, এর মাঝেই প্রকৃত স্বাদ বিদ্যমান। নফসকে অবদমিত করার স্বাদ নফসের গোলামি করার স্বাদ অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি।ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করুন।

হাদীস শরিফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তির অন্তরে কুদৃষ্টি দেওয়ার স্বাদ জাগলো। আর এমন কে বা আছে যার অন্তরে এরূপ আগ্রহ জাগে না। এখন তার অন্তর বারবার চাচ্ছে, তাকে একটিবার দেখেই নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলার প্রতি ভক্তি ও ভয়ের কারণে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তার

দিকে সে তাকালো না। এতে তার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ঈমানের এমন স্বাদ ও তৃপ্তি দান করবেন যে, তখন পূর্বের কুদৃষ্টির স্বাদ তার নিকট খুবই তুচ্ছ মনে হবে।

এটা নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিশ্রুতি, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

যে কোনো গুনাহের কাজ বর্জন করার ক্ষেত্রেও হাদীসটি প্রযোজ্য। যেমন গীবতের মধ্যে অনেক মজা, কিন্তু একবার যখন আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করে গীবত ছেড়ে দিবেন কিংবা গীবত করতে করতে থেমে যাবেন, তখন দেখবেন, কী রকম স্বাদও আত্মতৃপ্তি অনুভব হয়। মানুষ যখন গুনাহের স্বাদের পরিবর্তে গুনাহ বর্জনের স্বাদ আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর ভালোবাসা ও সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এভাবেই নফসকে অবদমিত করে নফসের তাযকিয়া অর্জিত হবে।

আত্মসমালোচনা করা (মুহাসাবাহ)

আত্মার পবিত্রতা ও উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর ও উপকারী ব্যবস্থা হলো আত্মসমালোচনা। মানুষ যখন সদিচ্ছা নিয়ে নিজের নাফসের অবস্থা ও কার্যকলাপ নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করে, তখন তার পক্ষে আর মন্দ পথে বা অন্যায় কাজে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকে না। কেননা, যখন সে নিজের নাফসকে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ভৎর্সনা ও শাসন করবে, তখন সে নাফস বাজে পথে ও অন্যায় কাজে জড়িত হওয়ার জন্য আর প্রেরণা যোগাবে না। এ কারণে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নিজের নাফসের হিসাব-নিকাশ নেয়ার জন্য তাগাদা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ -

"প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, কাল কিয়ামাতের দিনের জন্য সে কি পাথেয় সংগ্রহ করছে।" (আল-কোরআন, সূরা আল-হাশর, ৫৯: ১৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى

عَلَى اللهِ.

"বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে নিজের নাফসের সমালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সাফল্যের জন্য 'আমাল করে। আর নির্বোধ বা অক্ষম ঐ ব্যক্তি যে নিজের নাফসের কামনা-বাসনার অনুকরণ করে চলে এবং আল্লাহর নিকট বড় বড় আশা পোষণ করে। "

(তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান, (কিতাব: আয-যুহদ), হা. নং: ৪২৬০)

আমীরুল মু'মিনীন উমার (রা.) বলেন,

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا، وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا ، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا.

কিয়ামাতের দিন তোমাদের 'আমালের হিসাব নেয়ার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের নাফসের হিসাব-নিকাশ করো এবং তোমাদের 'আমালগুলো পরিমাপ করার আগে তোমরা নিজেরা নিজেদের নাফসকে মাপো। অধিকন্তু, (সে দিনে) 'আমালের বড় হিসাবের জন্য সুন্দররূপে প্রস্তুত হও। কেননা, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় নিজেই নিজের নাফসের হিসাব-নিকাশ করবে, কিয়ামাতের দিন তার হিসাব-নিকাশ সহজ হবে।

(তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯; ইবনু আবী শাইবাহ, আল- মুছান্নাফ, হা. নং: ৩৫৬০০ ৬১৫. তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯)

মাইমূন ইবনু মিহরান [৩৭-১১৭) (রা.) বলেন,

لَا يَكُونُ الْعَبْدُ نَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِي - نَفْسَهُ كَمَا يُحَاسِبُ شَرِيكَهُ مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ وَمَلْبَسُهُ.

যে যাবত না সে নিজের নাফসের হিসাব নেয়, যেমন সে নিজের অংশীদারের হিসাব নিয়ে থাকে যে, তার খাবার কোথেকে এলো, তার পোশাক কিভাবে সংগৃহীত হলো। "

(তিরমিযী, আস-সুনান, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ), হা. নং: ২৪৫৯)

উল্লেখ্য, মানুষ আত্মসমালোচনার এ প্রেরণা আল্লাহর ভয় থেকে লাভ করে থাকে। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে যতো বেশি ভয় করে, তার মধ্যে আত্মসমালোচনার মনোবৃত্তিও ততো বেশি পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তারীকাতের শাইখগণ মানুষের নাফস ও কর্মজীবনকে পরিশুদ্ধ করতে মুহাসাবা ও মু'আতাবাহ অর্থাৎ আত্মসমালোচনা ও আত্মভৎর্সনার তালীম দেন। বলাই বাহুল্য, এ আত্মসমালোচনা দিনে-রাতে যতো বেশি করা যায়, ততোই ভালো। অন্তত প্রতি দিন শেষে শোয়ার সময় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যে কাজগুলো করা হয়েছে তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এ সময় চিন্তা করা উচিত, দিনে যে কাজগুলো করা হয়েছে এবং করা হয়নি- তা যথার্থ ও সঠিক হয়েছে কি-না, যদি যথার্থ ও সঠিক হয়, তা হলে তার জন্য আল্লাহর শুকর আদায় করা উচিত। যদি তা যথার্থ ও সঠিক না হয়, তা হলে কি কারণে এমন হলো- তা খোঁজে বের করা দরকার এবং এর জন্য নাফসকে ভৎর্সনা করা উচিত।

মুহাসাবাহর অন্য একটি প্রকরণ হলো- মনের মধ্যে কোনো কাজ করার ইচ্ছা জাগ্রত হবার সময় চিন্তা-ভাবনা করে দেখা যে, কাজটি ভালো না-কি মন্দ? যদি ড়ালো হয়, তাহলে তা কি আজই সম্পাদন করা উত্তম হবে, না-কি আজ তা থেকে বিরত থাকা উত্তম হবে? যদি তা আজ সম্পাদন করা উত্তম হয়, তা হলে চিন্তা করতে হবে, তা করার পেছনে উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, না-কি কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভই উদ্দেশ্য? যদি চিন্তা-ভাবনার পর মন সাক্ষ্য দেয় যে, তা ভালো ও তার জন্য উপকারী এবং তা আজই সম্পন্ন করা প্রয়োজন, অধিকন্তু এর পেছনে উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, তবেই কাজটি সম্পাদন করতে তৎপর হতে হবে। অন্যথায় কাজটি করা থেকে বিরত থাকতে হকে। বলাই বাহুল্য, এরূপ চিন্তা-ভাবনা প্রতিটি কাজের আগেই কাজের চিন্তা জাগ্রত হবার শুরুতেই করতে পারলে ভালো।

বিশিষ্ট তাবি'ঈ আল-হাসান আল-বাসরী (রাহ.) বলেন,

رَحِمَ اللهُ عَبْدًا وقف عِنْدَ هَمِّهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَعْمَلُ حَتَّى يَهُمْ ، فَإِنْ كَانَ

خَيْرًا أَمْضَاهُ ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا كَفَّ عَنْهُ.

আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাহর প্রতি রাহমাত করুন, যে তার ইচ্ছার কাছে থেমে যায়! (অথাৎ ইচ্ছা জাগ্রত হবার পর সে তা দ্রুত বাস্তবায়নে নেমে পড়ে না; বরং চিন্তা-ভাবনা করে দেখে।) কেননা, প্রত্যেক বান্দাহই কাজের শুরুতে ইচ্ছা করে, তারপর কাজে অবতীর্ণ হয়। যদি চিন্তাভাবনা করে জানতে পারে যে, কাজটি ভালো, তবেই সে তা কার্যকর করে, আর যদি জানতে পারে যে, তা খারাপ, তবে সে বিরত থাকে।

(ইবনু আবী শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ, (কালামুল হাসান আল-বাসরী রাহ.) হা. নং: ৩৬৩৩৫)

যদি প্রতিটি কাজের শুরুতে এরূপ চিন্তা-ভাবনা করা না যায়, তা হলে অন্তত প্রত্যেক দিন সকালে ওঠে ফাজরের নামায শেষ করে কিছুক্ষণ বসে এভাবে চিন্তা- ভাবনা করা যেতে পারে যে, তার আজ কি কি কাজ করার দরকার আছে এবং এ কাজ ও দায়িত্বগুলোর গুরুত্ব কতোটুকু? তন্মধ্যে কোনটি ভালো ও উপকারী এবং কোনটি অপ্রয়োজনীয় ও অনর্থক? কোনটি আল্লাহর জন্য এবং কোনটি কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যে? এ সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের নাফসকে এভাবে উপদেশ দেয়া যেতে পারে যে, তুমি আজ অমুক অমুক কাজ করবে, অমুক অমুক কাজ থেকে বিরত থাকবে। সারা দিন এ উপদেশসমূহ মেনে চলবে। সূফীগণের পরিভাষায় নাফসকে প্রত্যহ দৈনন্দিন কার্যকলাপ সম্পর্কে পরামর্শ দান করাকে মুশারাতাহ বলা হয়।

এভাবে আত্ম সমালোচনা বা মুহাসাবার মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করা যায় ইন শা আল্লাহ।

সৎ ও মুত্তাকী লোকদের সোহবাত

নিঃসন্দেহে মানুষের চিন্তা-চেতনা, চরিত্র ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে সৎ ও মুত্তাকী লোকদের সুহবাত এবং সংশ্রবের গভীর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত যে ব্যক্তির সাথে যার নিরন্তর ওঠাবসা হয়, তার চিন্তা, আচার-আচরণের প্রভাবও ঐ ব্যক্তির ওপর পড়ে থাকে। কেননা বন্ধুত্ব, সাহচর্য ও সংশ্রব প্রভৃতি ক্রিয়াশীল। এর দ্বারা মানুষ স্বভাবতই দ্রুত প্রভাবিত হয়। কথায় বলা হয়, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' সৎ ও দীনদার লোকদের সুহবাত নিজেকে পবিত্র করে, ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে, অন্তর জীবিত করে এবং সত্য পথে চলতে প্রেরণা যোগায়। পক্ষান্তরে অসৎ ও দূরাচারী লোকদের সুহবাত মানুষকে বিপথগামী করে দেয়, অন্তরকে দুনিয়ার বিভিন্ন ধান্দায় মাশগুল করে রাখে ও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে দেয় বিশিষ্ট সূফী মাওলানা জালালুদ্দীন আর-রূমী [৬০৪- ৬৭২হি.) (রাহ.) বলেন,

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند.

সৎ লোকের সংশ্রব তোমাকেও সৎ লোকে পরিণত করবে এবং অসৎ লোকের সংশ্রব তোমাকেও মন্দ লোকে পরিণত করবে।

(বুখারী, আস-সাহীহ, (কিতাব: আল-বুহ্'), হা. নং: ১৯৯৫, (কিতাব: আয-যাবা'য়িহ ওয়াস সাইদ), হা. নং: ৫২১৪: মুসলিম, আস-সাহীহ, (কিতাব: আর-বিক্ ওয়াস সিলাতু...), হা. নং: ৬৮৬০)

এ কারণেই ইসলামে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সুহবাত ও সংসর্গ অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে অসৎ সঙ্গ বর্জনের জন্যও কঠোরভাবে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيمِ

إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

'সৎসঙ্গী হলো মেস্ক বহনকারী আর অসৎ সঙ্গী হলো হাপরে ফুঁকদানকারী সদৃশ। মেস্ক বহনকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমাকে আতর হাদিয়া দেবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে আতর খরিদ করবে অথবা অন্ততপক্ষে তুমি সুগন্ধি পাবে। কিন্তু হাপরে ফুঁকদানকারীর সান্নিধ্যে গেলে হয়তো সে তোমার কাপড় জ্বালিয়ে ফেলবে অথবা তুমি দুর্গন্ধ পাবে।

(আবু দাউদ, আস-সুনান, (কিতাব: আল-আদাব), হা. নং: ৪৮৩১)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ

مِنْ دُخانه

সৎসঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো মেস্ক বহনকারীর মতোই। যদি তুমি তার থেকে মেস্ক নাও পাও, ঘ্রাণ তো অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে অসৎ সঙ্গীর দৃষ্টান্ত হলো হাপরধারীর মতো। তার হাপরের স্ফুলিঙ্গ তোমার গায়ে না লাগলেও ধোঁয়া তো অবশ্যই লাগবে। হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নাফসের পবিত্রতা ও চরিত্রের উন্নতির এ ক্ষেত্রে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ লোকদের সুহবাত একটি অতি কার্যকর ও উপকারী ব্যবস্থা।

অতএব নেক সোহবত আত্মাকে পবিত্র করে।

আত্মার পবিত্রতা ও মুসলিম মনিষীদের অবস্থান:

হজরত থানবি রহিমাহুল্লাহু-এর একটি ঘটনা

হজরত ড. আব্দুল হাই রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে শোনা একটি ঘটনা । তিনি বলেছেন যে, একবার হাকিমুল উম্মত হজরত আশরাফ আলি থানভি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দিল্লির মসজিদের মিম্বরে বসে ওয়াজ করেছিলেন, অনেক বড় সমাবেশ হয়েছিল। ওয়াজ করতে করতে বলতে লাগলেন যে, আজকে আমি আপনাদেরকে একটি কথা বলছি, এই কথাটি আমার থেকেই শুনবেন, অন্য কারও কাছ থেকে শুনবেন না। আমি এই কথাটা 'তাহদিসে নিয়ামত' হিসেবে বলছি। এই জ্ঞান আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন। এ কথা বলার পরে এক মুহূর্তের জন্য তিনি চুপ হয়ে গেলেন। এর পরে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আপনাদেরকে এই বাক্য বলেছি যে, "এই কথাটা আমার থেকেই শুনবেন, অন্য কারও থেকে শুনবেন না।' এই দাবি তো 'তাআল্লির' অন্তর্ভুক্ত। আমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছি এবং এটাকে আমি 'তাহদিসে নিয়ামত' নামে নামকরণ করছি। অতএব, এর ওপর ইসতেগফার করলাম আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। প্রথমত, আমি আমার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছি, এরপরে এই শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করাকে 'তাহদিসে নিয়ামতের' পর্দা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর নিয়ম হলো আমি এই গুনাহ প্রকাশ্যে করেছিলাম, এজন্য তাওবাও প্রকাশ্যেই করছি।

এটা আমার থেকে ভুল হয়েছে, এই ভুলের ওপর ইসতেগফার পড়ছি- আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমি ওয়াজের মধ্যেই এই কাজ করে ফেলেছি। এভাবে অন্য কেউ করে দেখাও। এই কাজ ওই ব্যক্তিই করতে পারে, যে নিজে নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছে, নিজেকে বিলীন করে দিয়েছে এবং যে নিজের নফসের সূক্ষ্ম বিষয়ের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত আছে এবং নফসের ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখে, সর্বদা নফসের হিসাব-নিকাশ করতে থাকে। এখন আপনারা দেখুন যে, আমি যে কথা বর্ণনা করছি এটা 'তাআল্লি' হিসেবে বর্ণনা করেছি নাকি 'তাহদিসে নিয়ামত' হিসেবে বর্ণনা করেছি? এর মাঝে

পার্থক্য করা অনেক বড় কঠিন কাজ এবং এটা বুঝতে পারা সকলের সাধ্যের মধ্যে নয়।

হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ-এর সতর্কতা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি (রহিমাহুল্লাহ), যার নাম আমরা প্রায়ই উল্লেখ করে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন। তিনি ফতওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের সহজ দিকটার ফিকির করতেন, যাতে মানুষের কষ্ট না হয় এবং যথাসম্ভব সহজ হয়। আজকাল বাজারে ফল ফলাদি বিক্রি হয়। আপনারা আশা করি জানেন, তার অধিকাংশই এমন যে, ফুল আসে নি। আর এ ধরনের ফল বিক্রি করা শরিয়ত জায়েয নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ফল ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন- যতক্ষণ পর্যন্ত ফল প্রকাশিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্রি করা জায়েয নেই। শরিয়তের এ বিধানের কারণে বাজারে প্রচলিত উল্লিখিত ফল ক্রয় করে খাওয়া জায়েয নেই বলে কোনো কোনো আলেম ফতওয়া দিয়েছেন। কিন্তু হযরত থানবি রহিমাহুল্লাহ রায় প্রদান করেন, এ ধরণের ফল খাওয়া জায়েয আছে। অথচ তিনি নিজে সর্বদা এর থেকে বেঁচে থেকে ছিলেন। জীবনভর কখনো বাজার থেকে এ ধরনের ফল ক্রয় করে খাননি। অন্যদেরকে যাওয়ার অনুমতি তো দিয়েছেন, কিন্তু নিজে সতর্কতাস্বরূপ খান নি। এরাই আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা। অন্যদেরকে যে নসিহত করতেন, নিজে তার চেয়ে বেশি আমল করতেন। এই জন্যই তাদের কথা হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করতো।এভাবে তারা তাযকিয়ার চর্চা করতেন।

ইমাম গাযালি রহিমাহুল্লাহর ঘটনা

ইমাম গাযালি (রহিমাহুল্লাহ)-কে আমরা সকলেই জানি। তিনি অনেক বড় আলেম ও সুফি ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন সুমহান মর্যাদা। তাঁর এক ভাই ছিলেন সুফি প্রকৃতির। ইমাম গাজালি যখন ইমামতি করতেন, তখন তাঁর এ ভাই তাঁর পেছনে নামায পড়তেন। একবার তিনি ইমাম গাযালীর পেছনে নামায পড়া ছেড়ে দিলেন। বিষয়টি তাঁদের আম্মার কানে গেলো। তাই তিনি তাঁর এ সুফি ছেলেকে ডেকে

বললেন, কী ব্যাপার তুমি গাযালীর পেছনে নামায পড়ছো না কেন? তিনি মাকে উত্তর দিলেন, তাঁর আবার নামায, আমি তাঁর পিছনে নামায পড়বো কীভাবে? তিনি যখন নামাযে দাঁড়ান, তখন হায়েয- নিফাসের নানা মাসআলা তাঁর মাথায় গিজগিজ করে। আম্মাজান। আপনিই বলুন, এ অপবিত্র জিনিস যার মাথায় ভর করে থাকে, তাঁর পেছনে কি নামাজ পড়া যায়?

মাও তো আর সাধারণ মা নন। তিনি তো ছিলেন ইমাম গাযালির মা। তাই তিনি উত্তর দিলেন, নামাযের মধ্যে ফিকহী মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা নাজায়েয নয়। আর তুমি কী করো? তুমি তো তোমার ভাইয়ের দোষ ধরার পেছনে লেগে থাক। আর এ কাজটি নামাযের ভেতরেই কর। নামায পড়াকালীন অপরের দোষ খোঁজ করা তো হারাম। সুতরাং তুমিই বলো, সে উত্তম না তুমি উত্তম?

যা হোক, ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহর আম্মা তাঁর ছেলেকে এটাই বুঝিয়ে ছিলেন যে, নামাযের মাঝে ফিকহি মাসআলা নিয়ে চিন্তা করা গুনাহ নয়। সুতরাং এটা নামাযের একাগ্রতা পরিপন্থী নয়।

শায়খ আবুল হাসান নুরি রহিমাহুল্লাহুর ইখলাস

শায়খ আবুল হাসান নুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উঁচু স্তরের একজন বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে জানা যায় যে, একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন যে, সমুদ্রের পাশে নৌকা থেকে কিছু মটকা নামানো হচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, এগুলো মদের মটকা। কোনো এক বর্ণনায় রাষ্ট্র থেকে তৎকালীন বাদশার জন্য অন্য নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বড় একটি জাহাজে উঠিয়ে তার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শায়খ আবুল হাসান নুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দিলে অনেক কষ্ট অনুভব হলো যে, মুসলিম দেশের একজন শাসক সরাবের মটকা আনিয়েছেন। তখন তাঁর মধ্যে নাহি আনিল মুনকার তথা খারাপ কাজ থেকে বাধা দানের জজবা সৃষ্টি হয়ে গেল। তাই তিনি মটকাগুলো একটা একটা করে ভাঙ্গতে শুরু করলেন। সেখানে ২০ টি মটকা ছিলো। ১৯ তম মটকাও ভেঙে ফেললেন। যখন ২০ তম মটকা ভাঙ্গার জন্য হাত উঁচু করলেন, তখন হঠাৎ কিছু একটা ভেবে ঐ অবস্থায় রেখে দিয়ে চলে আসলেন। কোনো

একভাবে এই সংবাদ বাদশাহের কানে পৌঁছে গেলো যে, অমুক ব্যক্তি ১৯ টি মটকা ভেঙে দিয়েছে। বাদশা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটা আপনি কীভাবে করলেন? তিনি বললেন, কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে যে, নেক কাজের আদেশ করো এবং খারাপ কাজ থেকে প্রতিহত করো এবং এর ফলে যে কষ্ট আসে এর ওপর ধৈর্য ধরো। সুতরাং যখন আমি দেখলাম যে, এই খারাবি আপনার পর্যন্ত পৌঁছবে এবং মাখলুকের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে, তখন এগুলোকে ভাঙ্গতে চেয়েছি। কিন্তু যখন এই চিন্তা দিলে আসল যে, তুমি বড় বাহাদুর, বাদশার বন্দি এবং শাস্তির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করেছ। এরপর যখন লোকেরা এটা জানবে যে, আবুল হাসান সাহস দেখিয়ে বাদশার মদের মটকা ভেঙে দিয়েছে, তখন লোকদের মাঝে তোমার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে। যখন আমার এই খেয়াল আসলো তখন আমার ভাঙা আল্লাহর জন্য থাকল না। বরং মাখলুকের প্রশংসা অর্জনের জন্য হয়ে গেল।আগে যতগুলো মটকা ভেঙ্গেছিলাম, সেগুলো আল্লাহ তাআলার হুকুম মানা এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ভেঙ্গেছিলাম। আর যদি শেষ মটকাও ভেঙে ফেলতাম তাহলে সেটা নিজের নফস এবং মানুষকে দেখানোর জন্য ভাঙা হতো। অতএব, ২০ তম মটকা রেখে দিয়েছি।

হজরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঘটনা

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শিক্ষক ছিলেন এবং বড় মাপের বুজুর্গও ছিলেন। থানবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারাগাতের পর কানপুর মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করলেন। কানপুরের লোকদের মাঝে বিদআতের বেশ প্রচলন ছিল। কুরআন ও হাদিসের প্রতি সেখানকার মানুষের মনোযোগ কম ছিল। মানতেক ও ফালসাফার দিকে তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। তখন উলামায়ে দেওবন্দের আকর্ষণ কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি বেশী ছিল। এ কারণে, ওই লোকেরা ওলামায়ে দেওবন্দেরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখত। হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার ভাবলে যে, হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহমতুল্লাহি আলাইহিকে কানপুর ডেকে নেবেন এবং তারপর ওখানে নসিহত করাবেন। যাতে লোকদেরকে দীনের হাকিকত বুঝাতে পারেন এবং এটাও তারা জানতে পারে যে, উলামায়ে দেওবন্দ প্রত্যেক বিষয়ে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখেন। সুতরাং, যখন জলসার সময় হয়ে গেল, তিনি হযরত শাইখুল হিন্দকে

ডেকে নিলেন। বয়ানের মাঝে হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইশারায় বললেন যে, হজরত। বিশেষভাবে অমুক বিষয়ে ওয়াজ করুন। কেননা, এখানে এই মাসআলা নিয়ে মানুষ অনেক ভুল বুঝাবুঝির মধ্যে রয়েছে। মাসআলার সম্পর্ক মানতেক ও ফালসাফার সঙ্গে ছিল। হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সময় ওয়াজ শুরু করলেন, ওই সমস্ত লোকেরা তখনও পৌঁছেনি, যাদেরকে ওয়াজ শোনানো উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তারা এসে গেল। হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওই মাসআলার ওপর আলোচনা শুরু করে দিলেন। যে ব্যাপারে হযরত বড় উঁচু পর্যায়ের আলোচনা করলেন। বয়ান তখনো চলমান। হঠাৎ শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বললেন যে, আমি সামনে আলোচনা করতে অপারগ। এ বলেই বয়ান শেষ করে দিলেন। হযরত থানবি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে, আমার সন্দেহ লাগল যে, যখন বয়ানের মূল সময় এসেছে, তখন হযরত কেনো বসে গেলেন? সুতরাং, আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এখন তো আলোচনার মূল পর্ব ছিল। অথচ, আপনি ওয়াজ শেষ করে দিলেন যে! হযরত শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে, মূলত আমার এই খেয়াল এসেছিলো যে, এখন আমি ওই লোকদের সামনে নিজের ইলেম ও জ্ঞান প্রকাশ করব। তাই যদি আমি ওয়াজ চলমান রাখি, তাহলে এটা আল্লাহ তাআলার জন্য হলো না। বরং, আমার নিজেকে প্রদর্শন করা এবং নিজের ইলেমের বড়ত্ব প্রকাশ করা হয়ে গেল। আর এমন ওয়াজ অনর্থক, যার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্ট হবে না, বরং নিজের ইলেম প্রকাশ করা বাসনা হবে। এটা কোনো সাধারণ বিষয় নয় যে, মানুষের সাধারণ সমাবেশে আলোচনা করার মধ্যে এই কল্পনা করে বসবে যে, এতক্ষণ যা কিছু বলেছি, এগুলো আল্লাহ তা'আলার জন্য ছিল। কিন্তু এখন যা কিছু বলব, এগুলো নিজের ইলেম প্রকাশ করার জন্য হবে। মূলত হুব্বে জাহ থেকে বাঁচার জন্য এরকম করার দরকার পড়ে।সুতরাং

যেকোনো দায়িত্ব, যেকোনো পদ, নিজের প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য অর্জন করা - নিম্নস্তরের কাজ। তবে মাখলুকের ফায়দার জন্য এবং তাদেরকে শান্তি পৌঁছানোর জন্য পদ গ্রহণ করার অনুমতি তো রয়েছে।

বুজুর্গগণ বিনয়ের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালা হয়ে থাকেন। অনেক সময় সুনাম, সুখ্যাতি, পদ অথবা প্রভাব চাওয়া ছাড়াই অর্জন হয়ে যায়। সাধারণত এটা এই সমস্ত

আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে হয়, যারা নিজেরা নিজেদেরকে বিনয়ের মাধ্যমে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং দুনিয়া তাদের কদমের ওপর এসে যায়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরিফে ইরশাদ করেছেন যে-

من تواضع لله رفعه الله

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে উঁচু মর্যাদা দান করেন।

সুতরাং, যারাই বুজুর্গ এবং আল্লাহর ওলি হন তাঁরা চান যে, কেউ আমার খবর না জানুক। আমি গোপন থাকব। কিন্তু যে সুগন্ধি মোহিত করে, তা লোকদেরকে আকৃষ্ট নিজের কাছে টেনে নেয়। যদিও তারা নিজেদের আশপাশে বেড়া দিয়ে রাখেন, কিন্তু মাখলুক তাঁদের কদমে গিয়ে পড়ে থাকে। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এরকম সুগন্ধি দান করেছেন, যা চাওয়া ছাড়াই তাঁদের অর্জন হয়েছে। আর এটা আল্লাহ তাআলার বড় একটি নিয়ামত।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহিমাহুল্লাহর ঘটনা:

'আনফাসে ঈসা' এটি হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ-এর আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক বাণী সংকলন। এ কিতাব মূলত হযরতের তারবিয়াতি হেদায়াত এবং আত্মার চিকিৎসার পরিচ্ছন্ন ও পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্রসমূহের সারাংশ। এটি হযরতের বিশিষ্ট খলিফা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহিমাহুল্লাহ সংকলন করেছেন। হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ-এর খলিফা অনেক। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী হযরত থেকে ফয়েজ হাসিল করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য (হেদায়াতের) সূর্য এবং চন্দ্রতুল্য। কিন্তু হযরতের প্রত্যেক খলিফারই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য এমন ছিলো, যা তাঁকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহিমাহুল্লাহ হযরতের প্রথম দিকের খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত তাঁর সম্পর্কে একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ -এর সঙ্গে সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে তার কোন নজির

ছিলো না। বাহ্যিক আকার,আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, কথা-বার্তা, মোটকথা। সকল বিষয়েই হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে তার চমৎকার মিল ছিলো। এমন কি কণ্ঠস্বরেও এমন বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিলো যে, তিনি যখন কুরআনুল কারিম তেলাওয়াত করতেন তখন বাইর থেকে যারা শোনতেন তাঁরা অনেক সময় বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতেন যে, হযরত থানভি রহিমাহুল্লাহ তেলাওয়াত করছেন? নাকি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহিমাহুল্লাহ তেলাওয়াত করছেন? বাহ্যিকভাবেই যখন এমন মিল, তাহলে আধ্যাত্মিকভাবে তিনি কত বেশি ফয়েয লাভ করেছেন? তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

যখন কোনো ব্যক্তির তার শাইখের সঙ্গে এ পর্যায়ের গভীর মুহব্বত হয়ে যায় এবং পূর্ণরূপে মুনাসিবাত হয়, সাথে সাথে দীর্ঘদিন তার সোহবত ও সান্নিধ্য লাভ হয়, গভীর মনোযোগ, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সাথে ফয়েজ হাসিল করে, তখন কোন কোন সময় বাহ্যিক আচার আচরণ ও অভ্যাসের ক্ষেত্রেও অপূর্ব সাদৃশ্য তৈরি হয়।

শায়খ ফরিদুদ্দীন আত্তার রহিমাহুল্লাহ

আল্লাহ তাআলার কিছু নেক বান্দা এমনও আছেন, যাঁদেরকে তিনি নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কিছু সরস শক্তি প্রেরণ করেন। এসব সরস শক্তি পাঠানোর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার নেশা তাড়িয়ে দিয়ে তাঁর ভালোবাসার প্রতি আহবান করেন। প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার রহিমাহুল্লাহ এমনই একজন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহধন্য বান্দা।মুফতী মুহাম্মদ শফী রহিমাহুল্লাহ থেকে শুনা। তিনি বলেছেন, শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার ছিলেন একজন ইউনানী ঔষধ ও আতর ব্যবসায়ী। এ কারণেই তাঁকে 'আত্তার' বলা হয়। ওষুধ এবং আতরের বিশাল দোকান ছিল তাঁর। বাণিজ্যও বহু বিস্তৃত ছিল। সেই যুগে তিনি ছিলেন এক ঝানু দুনিয়াদার। ওষুধের বোতল আর আতরের শিশিতে তার দোকান ছিল সমৃদ্ধ। একদিন কোত্থেকে এক জীর্ণশীর্ণ আত্মভোলা দরবেশ তাঁর দোকানে প্রবেশ করলেন এবং দোকানের ভিতরে দাঁড়িয়ে তিনি ডান-বাম, উপরে-নিচে মোটকথা সম্পূর্ণ দোকান পর্যবেক্ষণ শুরু করলেন। একবার আতরের একটি শিশি আবার আরেকটি শিশি নিয়ে গভীর মনোযোগের সাথে

নাড়াচাড়া করতে লাগলেন এ অপরিচিত দরবেশ। এভাবে বেশ কিছু সময় যাওয়ার পর শায়খ ফরিদ উদ্দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: "এই যে, আপনি কী দেখছেন? কী খুঁজছেন?" দরবেশ উত্তর দিলেন, "না, কিছু না। এমনিতেই শিশিগুলো দেখছি।" শায়খ ফরিদুদ্দিন বললেন, আপনি কি কিছু কিনতে চাচ্ছেন?' দরবেশ এবারও উত্তর দিলেন, 'না, কিছু কেনার প্রয়োজন তো আমার নেই। ব্যস, কেবল দেখছি।' এই বলে দরবেশ আলমারিতে সজ্জিত শিশিগুলোর প্রতি নজর বোলাতে লাগলেন। এক একটি শিশি বারবার দেখতে লাগলেন। শায়খ ফরিদুদ্দিন এবার কিছুটা বিরক্তভঙ্গিতে বলে উঠলেন, 'অবশেষে আপনি দেখছেনটা কি?' দরবেশ বললেন, 'মূলত আমি দেখছি মরার সময় আপনার প্রাণটা বের হবে কীভাবে? কারণ, আপনার দোকানে শিশির যেরূপ বিশাল সমাহার দেখা যাচ্ছে, আপনি যখন মরবেন তখন প্রাণ বের হওয়ার সময় কখনো এ শিশিতে কখনো ওই শিশিতে ঢুকে পড়বে। এতগুলো শিশির মধ্য থেকে তখন আপনার প্রাণ কোন পথে বের হবে? বের হওয়ার পথ সে কীভাবে খুঁজে পাবে?"

শায়খ ফরিদুদ্দিন আত্তার যেহেতু তখনও ছিলেন একজন ব্যবসায়ী, তাই দরবেশের কথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন, 'আপনি আমার প্রাণের চিন্তা করছেন, আপনার প্রাণ বের হবে কীভাবে? আপনারটা যেভাবে বের হবে আমার প্রাণও সেভাবেই বের হবে।' উত্তরে দরবেশ বললেন, 'আমার প্রাণ বের হওয়ার ব্যাপারে এত চিন্তা কিসের। কারণ, আমি রিক্তহস্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, শিশি- বোতল, অর্থ-সম্পদ বলতে আমার কিছুই নেই।' এতটুকু বলেই দরবেশ দোকান থেকে বের হয়ে মাটিতে শুয়ে গেলেন এবং কালিমায়ে শাহাদাত: "আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু" পাঠ করলেন। এভাবে প্রাণবায়ু উড়ে যাওয়ার পর দরবেশ নিস্তেজ হয়ে গেলেন। ঘটনা এমনটিই ছিল যে, হজরত শায়খ ফরিদ উদ্দিন আত্তার রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অন্তরে একটা আঘাত লাগল যে, বাস্তবিকই তো দিনরাত এই দুনিয়ার কাজকর্মে মনোযোগী থাকি এবং এতেই লেগে থাকি। আল্লাহ তাআলার দিকে কোনো ধ্যান নেই এবং আল্লাহ তাআলার এমন একজন বান্দা যিনি সহজভাবেই আল্লাহ তাআলার দরবারে চলে গেলেন। মোটকথা, এটা আল্লাহ তাআলার দিকে আকর্ষণের একটি কারণ ছিল, যা তাঁর হিদায়েতের কারণ হয়ে গেল। অতএব, ওই দিন তিনি নিজের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য অন্যের কাছে সোপর্দ করলেন। আল্লাহ

তাআলা তাঁকে হিদায়েত দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার রাস্তায় লেগে থেকে এত বড় শায়েখ হয়েছেন যে, দুনিয়াবাসীর হিদায়েতের মাধ্যম হয়ে গিয়েছেন।

ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহ.-এর ঘটনা:

শায়খ ইবরাহিম ইবনু আদহাম রহিমাহুল্লাহু তাআলা এক এলাকার বাদশা ছিলেন। রাতে দেখলেন যে, তাঁর মহলের ছাদের ওপর এক ব্যক্তি টহল দিচ্ছে। তিনি মনে করলেন যে, হয়তো কোনো চোর এবং চুরির নিয়তে এখানে এসেছে তাকে পাকড়া ও জিজ্ঞেস করলেন, যে তুমি এই সময় এখানে কোত্থেকে এসেছ, কি করছো? বলল যে, মূলত আমার একটা উট হারিয়ে গিয়েছে ওর তালাশ করছি হযরত ইব্রাহিম ইবনু আদহাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বললেন যে, মাথা ঠিক আছে উট কোথায়? এবং মহলের ছাদ কোথায়? যদি তোমার উট হারিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে জঙ্গলে গিয়ে তালাশ কর। এখানে মহলের ছাদের উপর উট তালাশ করা বরং নির্বুদ্ধিতার কাজ।তুমি বড় নির্বোধ। তখন ওই ব্যক্তি উত্তরে বলল যে যদি এই মহলের ছাদে উট না পাওয়া যায় তাহলে এই মহলের মধ্য আল্লাহকে পাওয়া যাবে না যদি আমি নির্বোধ হই তাহলে আমার থেকে বেশি নির্বোধ তুমি এই মহলে থেকে আল্লাহকে তালাশ করা এর চেয়ে বড় নির্বোধিতার কাজ তার এই কথা বলার কারণে অন্তরে একটা আঘাত লাগলো তাই সমস্ত বাদশাহী ছেড়ে দিয়ে রওনা হয়ে গেলেন মোটকথা এটাও আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ ছিল।

উপরিক্ত ঘটনা থেকে আমরা উপদেশ লাভ করতে পারি দুনিয়ার অর্থ সম্পদ আরাম আয়েশ মানুষের হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে অর্থ সম্পদের নেশায় মত্ত অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত আসে না। আল্লাহ তাআলার মহব্বত হৃদয় উদ্ভাসিত থাকলে দুনিয়ার মহব্বত সে হৃদয় বদ্ধমূল হতে পারেনা। অর্থ সম্পদ থাকবেই তাই বলে তা ভালোবাসা বস্তু হতে পারে না। সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা থাকলে আমাদের নফসের পবিত্রতা অর্জিত হবে না।

আত্মার পবিত্রতার অভাবে মুসলিমদের দুর্দশা:

মুসলমানরা আজ নির্যাতিত, প্রতিটি জনপদে তারা আজ নিপীড়িত। মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি রাষ্ট্র আজ বহন করে চলেছে দুঃশ্চিন্তা, বেদনা ও হতাশা। বসনিয়া, কাশ্মির ও সোমালিয়াতে চলছে অমানবিক নির্যাতন। আফগানিস্তানের মুসলমানরা আত্মকলহে লিপ্ত। মোটকথা, বিমর্ষ হৃদয়ের অনিবার্য আর্তনাদ মুসলিম উম্মাহর সবখান থেকেই উচ্চারিত হচ্ছে। তারা আজ তীব্র সমস্যায় জর্জরিত। এর কারণ কী?

এর কারণ অনুসন্ধানে যখন আত্মনিয়োগ করি, তখন যে কারণটি চোখ ধাঁধিয়ে বেরিয়ে আসে, তা হলো- ইসলামের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আজ শিথিল হয়ে গেছে। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা থেকে আমরা ছিটকে পড়ে গেছি। ইবাদতের শক্তিমত্তা লাভে আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি। বদ-আমলের প্রবলতা আমাদেরকে অধিকার করে বসেছে। কথাগুলো তিক্ত হলেও সম্পূর্ণ বাস্তব। শুধু আমি নই, বরং যার মনে একতিল পরিমাণও ঈমান আছে, সেও এ কারণটি আজ অবলীলায় টের পাচ্ছে। কারণ, কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ

"তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'সুরা আশ শুরা আয়াত ৩০

এ অবস্থার কারণ ও পরিবর্তনের কথা বর্তমানে যেখানে- সেখানে শোনা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি, এর জন্য কত দল, কত পার্টি, কত সংস্থা ও সংগঠন তৈরি হচ্ছে। অথচ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি ঘোরালে এবং বাস্তবজীবনকে একটু কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে অনুভূত হয়, সংস্কার, শুদ্ধি ও দিন বদলের সকল প্রচেষ্টা একদিকে, সকল পাপাচারের সয়লাব আরেক দিকে। মানুষের মাঝে এতসব প্রচেষ্টার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বরং মনে হয় কিশতি বাঁকা পথেই চলছে। অগ্রগতি হচ্ছে কেবল অন্যায়, অপরাধ, পাপাচার ও অনিষ্টতার।

কবির ভাষায়-

یہ کیسی منزل ہے کیسی را ہیں کہ تھک گئے پاوں چلتے چلتے مگر وہی فاصلہ ہے
قائم وجو فاصلہ تھا سفر سے پہلے

এ কোন অদ্ভুত মঞ্জিল ও পথ। পথ চলতে চলতে পা নিথর হয়ে গিয়েছে অথচ দূরত্ব এখনও কমেনি, বরং ভ্রমণের পূর্বে যেমনটি ছিল, তেমনই রয়ে গিয়েছে।'

প্রশ্ন হলো, সংশোধনের এত সব প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না কেন? সংশোধনের শুরুটা ওপর থেকে হয় এ প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দিয়েছেন। সংশোধনের এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো, প্রত্যেকেই সংস্কারের পতাকা হাতে নিয়ে চায়, সংশোধনটা যেন অপর থেকে শুরু হোক। অর্থাৎ- প্রত্যেকের মনে একটা ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, মানুষ নষ্ট হয়ে গেছে, পাপাচারের মাঝে ডুবে আছে, ঘুষ খাচ্ছে, সুদ খাচ্ছে, নগ্নতার বাজার চরম গরম হয়ে আছে। সুতরাং মানুষকে শোধরাতে হবে, এসব কাজ থেকে তাদেরকে বাঁধা দিতে হবে।

কিন্তু কেউ কখনও নিজের অবস্থাটা খতিয়ে দেখার ফুরসত পায় না, কতটা পরিবর্তন ঘটেছে নিজের মধ্যে, কত করুণ হয়েছে নিজের অবস্থাটা এই বিষয়ে চিন্তা ফিকির করে না।

ইরাকের ওপর আমেরিকার আগ্রাসন।

বিগত দিনে ইরাকের ওপর যে তান্ডবলীলা শুরু হয়েছে এটাকে কেন্দ্র করে আজ গোটা মুসলিম উম্মাহর হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। বাগদাদের পতনে মুসলমানদের হৃদয় ভেঙে গেছে। সবাই উদ্বিগ্ন,উৎকণ্ঠিত। কারণ, একটি মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর বর্বরতার চরম পরীক্ষা চালানো হচ্ছে: অথচ গোটা দুনিয়া কেবল তামাশা দেখছে। একটি মুসলিম রাষ্ট্রও এই বিপর্যস্ত মুসলিম রাষ্ট্রটির পাশে দাঁড়ালো না। আমেরিকার এই অন্যায় আচরণে তাই গোটা মুসলিম আজ শোকাহত। অসহায়ত্ব ও আক্ষেপের আর্তনাদচিত্র উম্মাহর সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কুরআন অনুযায়ী না চলার পরিণাম:

কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে উপায় উপকরণের জগত বানিয়েছেন এবং আমাদের ওপর তিনি কিছু দায়িত্ব কর্তব্য আরোপ করেছেন। যে-ব্যক্তি দুনিয়াতে যেমন উপকরণ গ্রহণ করবে, তাকে সেই হিসেবে ফলাফল দেওয়া হবে। দুনিয়ার ব্যাপারে এটাই আল্লাহ তাআলার নীতি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আমাদের অবস্থা হলো এই- আমরা কুরআনুল কারিমের নির্দেশনাবলিকে পেছনে ফেলে দিয়েছি। আমাদের প্রতি কুরআনুল কারিমের নির্দেশসমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো-

তোমরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষাশক্তি গড়ে তোলো।(সুরা আনফাল ৩০)

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে কুরআনুল কারিম এই নির্দেশ দিয়েছে যে, তোমরা যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখো, যাতে তোমাদের ভয়ে আল্লাহ তাআলার দুশমন ও তোমাদের শত্রুরা সন্ত্রস্ত থাকে।

কুরআনুল কারিমের এই নির্দেশের দাবি তো ছিলো এই যে, গোটা মুসলিম উম্মাহ যেখানেই বসবাস করুক না কেন, নিজেদের প্রতিরক্ষাশক্তি মজবুত করার চেষ্টা করবে এবং মুসলমানদের প্রতিরক্ষার জন্য যত ধরনের উপরকণ দরকার হয়, যেমন সমরাস্ত্রের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সংহতি ইত্যাদি গড়ে তুলবে।

পর্যাপ্ত উপকরণ কি মুসলমানদের আছে:

অথচ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আজ যদি মুসলমানদের সমষ্টিগত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তাহলে দেখা যাবে, মুসলমানরা নিজেদেরকে শক্তিমান করার পরিবর্তে নিজেদের লাগাম অন্যদের হাতে ছেড়ে রেখেছে। মুসলমানদে সংখ্যা বর্তমানে যত বেশি, অতীতে কখনও সংখ্যায় তারা এত অধিক ছিলো না। আজ মুসলমানদের হাতে এত অধিক পরিমাণে উপকরণ আছে, অতীতে কখনও তারা এত উপকরণের অধিকারী

ছিলো না। মুসলমানরা সম্পদের দিক থেকেও অতীতের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশি শক্তিশালী। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় উৎপাদনভূমি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন। তেলসম্পদ মুসলমানদের দেশে দান করেছেন। গোটা বিশ্বের মানচিত্র হাতে নিয়ে দেখুন; দেখতে পাবেন, বিশ্বমানচিত্রের 'কলিজা' মুসলমানদের হাতে রয়েছে।

ব্যক্তিগত স্বার্থকে সামনে রাখার পরিণাম মরক্কো থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পরস্পর যুক্তভাবে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান। মনে হয় যেন একটি চেইন, যেখানে মুসলমানদেরকে গেঁথে নেওয়া হয়েছে। মাঝখানে শুধু দুটি রাষ্ট্র বাধা হয়ে আছে। একটি হলো ইসরাঈল, অপরটি ভারত। বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ রাজপথগুলো মুসলমানদের দখলে। সুয়েজখাল মুসলমানদের। বসফরাস মুসলমানদের অধীনে। এডেন উপসাগর মুসলমানদের কাছে। মুসলমানরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই শক্তিগুলোকে কাজে লাগায়, তাহলে তারা অমুসলিমদের দম নাকের আগায় নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা তো যার-যার আখের গোছাতে ব্যস্ত। মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজেদের স্বার্থের হিসাবে মগ্ন। এর ফলে মুসলিমবিশ্বের উপচানো প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা আজ অমুসলিমের পণ্যের ওপর নির্ভরশীল। তাদের দেশে কোনো পণ্য তৈরি হয় না। এমনকি আমরা ব্যক্তিস্বার্থের ভাবনায় বিভোর। হালাল-হারামের এসব এজন্য হচ্ছে যে, আমরা আমাদের সকল সম্পদ ও উপায় উপকরণের ঘাড়ে 'স্বার্থপরতা' নামক ইবলিসকে চড়িয়ে রেখেছি প্রত্যেকের একটাই ধান্ধা, কীভাবে পকেট ভর্তি করা যায়।। পার্থক্য আজ মুসলমানদের চরিত্রে নেই। সাময়িক রস-আনন্দ, আরাম আয়েশ ও সফলতার পেছনে আজ ছুটে বেড়াচ্ছে। ক্ষণিকের এই সুখ শান্তির জন্য তারা প্রয়োজনে নিজেদের জাতি-ধর্মকে বিকিয়ে দিচ্ছে শাসক থেকে জনগণ পর্যন্ত সকলের মাঝে এই মানসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমাদের দেশে দুর্নীতি:

বর্তমানে সবাই দুর্নীতির জ্বালায় অতিষ্ঠ। প্রত্যেকেরই অভিযোগ- ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়েনা। অফিস-আদালতে সবাই হারাম খাওয়ার জন্য হা করে বসে আছে। এই জাতীয় অভিযোগ সবাই করছে। কিন্তু সুযোগ পেলে নিজেও এতে জড়িয়ে পড়ছে; বরং

ক্ষেত্রবিশেষ আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে। দুর্নীতিবাজের সমালোচকও সুযোগ পেলে মহা দুর্নীতিবাজ সেজে যাচ্ছে।

পার্থিব সফলতার জন্য চেষ্টা-শ্রম পূর্বশত:

এই দুনিয়া অবশ্যই আমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ দুনিয়াকে এজন্য বানিয়েছেন, যেন আমরা বৈধ উপায়ে চেষ্টা-শ্রম করে হালাল উপার্জন করতে পার এবং দুনিয়ার উপায়-উপকরণগুলোকে নিজের ও উম্মতের কল্যাণে ব্যবহার করতে পারি। ধোঁকাবাজি, মিথ্যাচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদির আশ্রয় নিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য আল্লাহ এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু মুসলমানরা আজ এই রীতিটাই অবলম্বন করে নিয়েছে। তাই সবখানেই তারা মার খাচ্ছে। শত্রুর ব্যাপারে কী অভিযোগ করবো? শত্রুর কাজই তো হলো আমাদেরকে ধ্বংস করা। অভিযোগ তো আমাদেরই মাথার ওপর খুলে আছে। আমরা আজ এমন এক গোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছি যে, দুনিয়ার যেকোনো জাতি আমাদেরকে নিয়ে হিংস্রতার মেতে উঠতে পারে। আবার তালি বাজাতে বাজাতে আমাদের মধ্যখান থেকে সটকে পড়তে পারে।

মহান আল্লাহ তাআলার নীতি:

মনে রাখতে হবে, বর্তমান পরিস্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত বদলাবে না, যতক্ষণ-না আমরা নিজেদেরকে বদলাবো।

কুরআনুল কারিম স্পষ্ট ভাষায় বলেছে-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।' (সুরা আর রাদ ১১)

কুরআনুল কারিম পনের'শ বছর পূর্বেই এই ঘোষণা দিয়ে রেখেছে। সুতরাং যদি তোমরা নিজেদের কারণে মার খাও, তাহলে তোমাদের ওপর এই মার চলতেই থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করবে।

আমাদের দোয়া কবুল হয়না কেন:

আজ মানুষ বলে থাকে, এত দোয়া করা হলো, আল্লাহ তাআলার কাছে এত প্রার্থনা করা হলো, কিন্তু আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেন নি। আমাদেরকে বিজয় দান করেন নি। বিজয়ী হয়েছে দুশমনরা। এর কারণ কী? এমন কি এ নিয়ে আনেকের ঈমান দোটানায় পড়ে গেছে যে, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করেন নি কেন?

কিন্তু আমি আগেও বলেছি যে, আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে উপায়- উপকরণের জগত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের সামাজিকতা, রাজনীতি ও চরিত্রকে আল্লাহ তাআলার বিধান পুরোপুরি মুক্ত রেখে বসেছি। এসব ক্ষেত্রে আমরা ইসলাম উপেক্ষা করে চলেছি।

আমরা শত্রুর মুখাপেক্ষী হয়ে আছি:

ইসলামের একটি অংশ হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, শক্তি সঞ্চয় করো। কিন্তু আমরা শক্তি সঞ্চয় করলাম না। তাছাড়া আমাদের শক্তি সঞ্চিত হবে কীভাবে? কারণ, আমাদের উপায় উপকরণসমূহের পেছনে থাকে ঘুষ ও দুর্নীতি। এরই কারণে আমরা সারাক্ষণ দুশমনের সামনে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তাদের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। সুতরাং দুশমন যদি আমাদের পিটুনি দেয়, যদি তারা আমাদের মাথার ওপর ক্ষমতার ছড়ি ঘোরায়, তাহলে দোষটা তাদের, না আমাদের? মূল দোষী তো আমরাই। কারণ, আমরা নিজেরাই তাদের সামনে নতজানু হয়ে পড়ে থাকি। আমরা নিজেদের অবস্থাকে এতই শক্তনির্ভর করে নিয়েছি যে, এখন তাদেরকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। আজও যদি আমরা আমাদের সম্পদগুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করি, যদি সততা ও আমানতদারির সাথে আমাদের সম্পদগুলোকে কাজে লাগানো হয় এবং আমরা যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার ব্যাপারে

দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি, তাহলে আমাদেরকে আর ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে অন্যের পেছনে ঘুরতে হবে না।

আমেরিকার কাপুরুষতা:

আমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছি, এত বড় একটি পরাশক্তি (আমেরিকা)- সমগ্র বিশ্বে যার শক্তি ও ক্ষমতার ডংকা বেজে আছে- সেও নিজের 'বীরত্ব' প্রদর্শনীর জন্য বেছে নিয়েছে নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে। আফগানিস্তান যার কাছে কোনো যুদ্ধবিমান নেই, আধুনিক অস্ত্র নেই, সুশৃঙ্খল একটি সেনাবাহিনী নেই কিংবা ইরাক যার ওপর বছরের পর বছর অবরোধ পড়েছিলো, যে দেশটি ঔষধের একটি ট্যাবলেটও অন্য দেশ থেকে আনার সুযোগ পায়নি, যে দেশটির যুদ্ধবিমানগুলো আকাশে উড়ানোর ব্যাপারে হলো, প্রায় আফগানিস্তান এবং তারপর ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে। যতদিন হয়েছে। সেখানে নিজের শক্তির প্রদর্শনী দেখাচ্ছে। তাও আবার একা নয়। হলে কমপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো, ততদিন সে কোনো দেশে আক্রমণ করার বরং বৃটেন ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে সর্বশক্তি একাট্টা করে প্রথমে দুঃসাহস দেখায় নি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষের পতনের পর সে নিজের শক্তিমত্তা দেখানোর জন্য বেছে নিয়েছে নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে। এসব নিরস্ত্র মুসলমানের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে নিজের শক্তি দেখানোর বাসনা নতুন করে আমেরিকার অন্তরে জেগেছে। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ নিজেকে এমন প্রতিপক্ষরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম না হবে যে, দুশমন যখন তার ওপর আক্রমণ করার জন্য উদ্যত হবে, তখন তার শক্তিমত্তা দেখে কেঁপে উঠবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের আক্রমণ-আগ্রাসন একের পর এক চলতে থাকবে। কাল আফগানিস্তানে আক্রমণ করেছে, আজ ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে, আগামীতে আরেকটি মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর চড়াও হবে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ যদি اعدوا لهم.... এই আয়াতের ওপর আমল শুরু করে নিজেদের প্রতিরক্ষাশক্তিকে মজবুত করে, তাহলে ইনশাআল্লাহ শত্রুরা আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকানোরও সাহস করবে না। তবে এই শক্তি দুর্নীতিঘেরা সমাজে তৈরি করা যায় না। এই শক্তি অর্জন করতে হলে প্রথমে আমাদের প্রত্যেককে আত্নসংশোধনে ও আত্মার পবিত্রতা অর্জনে উদ্যোগী হতে হবে। প্রত্যেককেই দুর্নীতি থেকে দূরে সরে এসে এই অভিশাপকে জীবন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে।

সীমালঙ্ঘনের পরিণতি:

পশ্চিমা বিশ্বে নারী আজ শুধুই ভোগ্যপণ্য। তাদের সমাজে নারী-পুরুষ এতই সস্তা যে, যৌনকামনা পূরণের জন্য হাত বাড়ালেই নারী পাওয়া যায়। নারী-পুরু ইচ্ছা করলেই যথেচ্ছাভাবে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারে। এতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। এতদসত্ত্বেও তাদের দেশগুলোতে ধর্ষণের ঘটনা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি ঘটে। এর কারণ হলো, তারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে সংঘটিত ব্যভিচারের স্বাদ নেয়, যা কখনও নিবারিত হওয়ার নয়। কোনো মানুষ যদি যৌনকামনা পূরণ করার জন্য অবৈধ পথে এলো, তাহলে তার অনিবার্য পরিণতি হয় এই যে, তখন সে কোনো সীমানায় গিয়ে শান্তি খুঁজে পায়না। সে আরো আত্মঘাতীভাবে সামনের দিকে ছুটতে থাকে। আপনারা 'পিপাসা' রোগের কথা হয়ত শুনেছেন। এর আরবী নাম- 'ইসতেস্কা'। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এই রোগের রোগী যদি কলসির পর কলসি পানি বরং এক পুকুর পানিও পান করে ফেলে, তবু তার পিপাসা নিবারণ হয়না। বৈধ সীমানার বাইরে যৌনাচারে অভ্যস্ত বাক্তির অবস্থা ঠিক এই রোগীর মতো। কোনো সীমানাতে গিয়ে সে প্রশান্তি ও স্থিরতা পায় না।বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা ঠিক এরকম। তারা যৌনকামনা পূরণের নিমিত্তে একটা পথে চলা শুরু করেছিলো। কিন্তু প্রশান্তি খুঁজে পায়নি। তারপর অগ্রসর হয়ে আরেকটি পথ আবিষ্কার করলো। কিন্তু সে পথেও শান্তি পায়নি। এরপর আরো সামনে অগ্রসর হলো, কিন্তু শাস্তি নেই। এভাবে শেষ পরিস্থিতি দাঁড়ালো এই যে, পশ্চিমা বিশ্বে এমন অসংখ্য ঘটনা ঘটে, যেগুলোর নায়কেরা কেবল যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে প্রশান্তি লাভ করতে পারে না; বরং নিজের চাহিদা মিটানোর পর ভিকটিম নারীটিকে হত্যা করে তারপর তারা প্রশান্তি পেতে চায়।

যেসব সমাজে বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচারের দরজা-জানালা উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, সে সব সমাজ আজ চরমভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। তাদের সমাজকাঠামো আজ ভেঙে পড়েছে। বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকার সভ্যতা গোটা বিশ্বে ঝুমঝুম করছে। অথচ যৌনতামুখর এই সভ্যতা মানুষকে কুকুর- বিড়াল আর গাধায় পরিণত করেছে। পশ্চিমাদের সমাজচিত্র খুবই করুণ ও উৎকট। শালীনতা-সতিত্বের স্থলে চারিত্রিক অবক্ষয় ও বেহায়াপনা তাদের সমাজে এত বেশি চর্চিত হচ্ছে যে, কোনো কোনো এলাকার রেকর্ড হলো, ওখানের শতকরা সত্তর কিংবা আশি ভাগ নাগরিক জারজ।

পশ্চিমাদের পরিবারব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে। পিতা-পুত্র, মা-মেয়ে, ভাই-বোন নামক পরিচয়গুলো তাদের পারিবারিক পরিবেশে আজ নেই বললেই চলে। আজ পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিজীবিরা এই বলে আর্তনাদ করছে যে, আমরা চারিত্রিকভাবে পতনের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছি। এর কারণ হলো, কুরআনুল কারিম সহজাত কামবাসনা পূরণের ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহ নামক যে-বৈধ পথটি বাতলে দিয়েছিল, তাকে পরিত্যাগ করে তারা অবৈধ পথগুলো বেছে নিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এমন একটি ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছেন যে, এই জৈবিক চাহিদা যদি বৈধ সীমানার মধ্যে থাকে, তা হলে এটি মানবসম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যম হয় এবং অনেক উপকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যখন একে বৈধ সীমানার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন এটি অতৃপ্তিদায়ক সর্বগ্রাসী।

আমাদের অন্তরকে এই রোগগুলো থেকে পবিত্র করতে হবে।

দুর্নীতি অশ্লীলতা আমাদের মাঝে শেকড় গেড়ে বসেছে। এর কারণ হলো, আমাদের অন্তরজুড়ে সম্পদের ভালোবাসা গেঁথে আছে। অন্তরে পার্থিব আরাম- আয়েশের মোহ বিরাজ করছে।

পার্থিব জগতের প্রতি আমাদের এই উদ্দাম ভালোবাসা অকেজো করে দিয়েছে। পবিত্র কোরআন বলছে- আমাদেরকে

وَالَّذِينَ هُمْ الزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

সফল মুমিনরা নিজেদেরকে এই রোগ থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। সুতরা আমরা যদি নিজেদের উক্ত ব্যাধি থেকে পবিত্র রাখতে পারি, তাহলে আমরাও সফল মুমিন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে এই কথাগুলোর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

শেষকথা

পরীক্ষার এই দুনিয়ায় মানুষের ফিতরাত ও তবিয়তকে মূল থেকে দূর করা সম্ভব নয়। তাই সূক্ষ্মদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এগুলোকে এমন সব উপকারী ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যা হারাম কিংবা অবৈধ নয়, যা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টিতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করে না এবং তাঁর দৃষ্টি থেকে ফেলেও দেয় না।

ইসলামে কিছু ভুল ধারণা অনুপ্রবেশ করার কারণে অনেকেই মনে করেন যে, সহজ পরিশ্রমে ও সাধারণ মুজাহাদায় নফস বা অন্তর পবিত্র করা এবং উত্তম চরিত্রাবলিতে গুণান্বিত হওয়া অসম্ভব! আসলে তাদের এই ভাবনা তাদেরকে আরও জটিল জটিল রোগব্যাধি, পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহিতে নিক্ষেপ করে।

আত্মা পবিত্র করার বিষয়টি মূলত রাসূলগণের ওপর অর্পিত। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এই দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করেছেন, তাঁদের হাতেই এর সংশোধন প্রক্রিয়া রেখেছেন। তাঁরা মানুষজনকে দাওয়াত দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, সঠিক দিকনির্দেশনা দান করে তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করবেন। ইলহাম বা অন্য কিছু দিয়ে নয়। রাসূলগণ উম্মাতের অন্তরের চিকিৎসা করার জন্যই প্রেরিত হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ .

"তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[সুরা জুমুয়া ৬২:২]

শরীরের চিকিৎসা করার চেয়ে অন্তর পরিশুদ্ধ করা অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ-এর সুন্নাহ বহির্ভূত পন্থায় যে ব্যক্তি রিয়াযত, মুজাহাদা, সাধনা ও নির্জনতা অবলম্বন করে নিজের নফসকে সংশোধনের চেষ্টে করে, সে ওই রোগীর শরীরের চিকিৎসা করার চেয়ে অন্তর পরিশুদ্ধ করা অনেক বেশি কঠিন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ-এর সুন্নাহ বহির্ভূত পন্থায় যে ব্যক্তি রিয়াযত, মুজাহাদা, সাধনা ও নির্জনতা অবলম্বন করে

নিজের নফসকে সংশোধনের চেষ্টে করে, সে ওই রোগীর মতো; যে অভিজ্ঞ চিকিৎসককে বাদ দিয়ে নিজে নিজেই আপন খেয়াল ও সিদ্ধান্ত অনুসারে রোগের চিকিৎসা করা শুরু করে! আসলে আল্লাহর রাসূলগণ হলেন অন্তরের চিকিৎসক। তাই অন্তরের সংশোধন ও পরিশোধনের জন্য তাঁদের দেখানো পথ গ্রহণ করা, তাঁদের নিকট নিজেকে সমর্পণ করা এবং তাঁদের একান্ত অনুগত হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই।আর এইজন্য আমাদের অন্তর আত্মা কে পবিত্র করে প্রশান্তকারী আত্মায় রুপান্তর করা জরুরি।আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন:

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفۡسُ الۡمُطۡمَئِنَّةُ ﴿ۖ٢٧﴾
ارۡجِعِىۡۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرۡضِيَّةً ﴿ۚ٢٨﴾
فَادۡخُلِىۡ فِىۡ عِبٰدِىۡ ﴿ۙ٢٩﴾
وَ ادۡخُلِىۡ جَنَّتِىۡ ﴿٣٠﴾

অর্থ:
"হে প্রশান্ত আত্মা!তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে।অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।আর প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।"(সুরা আল ফাজর আয়াত:২৭-৩০)

সারকথা এই যে, কুরাআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের আখলাককে পরিশুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।আমাদের নফসকে প্রশান্ত করার উপদেশ দিয়েছেন। আখলাক দ্বারা অভ্যন্তরীণ আমল উদ্দেশ্য। আখলাককে পরিশুদ্ধ করার উত্তম ও সহজ পন্থা হলো আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত অবলম্বন করা। এজন্য আল্লাহ ওয়ালাদেরকে তালাশ করতে হবে। তাদের সোহবত অবলম্বন করতে হবে। তাদের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের আত্মাকে পবিত্র ও প্রশান্তময় করুন। আমীন।ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

ফুটনোট

১.তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি
আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, পথ পদ্ধতি ও ভ্রান্তি নিরসন
মুল:শাইখুল ইসলাম মুফতি মুহম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকতুহুম
অনুবাদ:মাওলানা মুহম্মদ জালালুদ্দিন

২.তাযকিয়াতুন নাফস
ড.আহমদ আলী(প্রফেসর,ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম)

৩.রুহ কি এবং কেমন
বাংলা অনুবাদ ও বিশ্লেষণ :আলহাজ্ব মাওলানা এ,কে,এম,ফজলুর রহমান মুনশী

৪.মাদারিজুস সালিকীন
মূল:ইমাম ইবনুল কায়্যিম রাহিমাহুল্লাহ
পরিমার্জন:শাইখ সালিহ আহমাদ শামি
অনুবাদ:মাওলানা আসাদ আফরোজ

৫.তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
শাইখুল ইসলাম আল্লামা জাস্টিস তাকি উসমানী (দামাত বারকাতুহুম)
অনুবাদ:মুফতি আলী আসগর কাসেমী